গোনাহ্ ও তাওবা
অভিশাপ ও রহমত

মূল
শাইখুল ইসলাম
মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
[জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, ইসলামী অর্থনীতিবিদ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা, বিচারপতি ও শাইখুল হাদীস]

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারুক
জামিয়া রশীদিয়া, গাজীপুর

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
....
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিসমিহি তা'আলা

প্রকাশকের কথা

এ যুগের জগদ্বিখ্যাত আলেম ও মুফতী, যিনি আধুনিক মাসয়ালা-মাসায়েল বিশেষ করে প্রচলিত ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকিংয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক ও বাস্তবিক ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি ও সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিংয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান বিশেষতঃ উলামায়ে কেরামের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তিনি হলেন, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। তালীম, তারবিয়্যাত, তাবলীগ, তাসনীফ (রচনা) ও তাযকিয়া সহ ইসলামী খেদমতের প্রায় সকল অঙ্গনেই তাঁর সমান বিচরণ।

তবে প্রতি সোমবার ও শুক্রবারে অনুষ্ঠিত তাঁর 'ইসলাহী মজলিস' এর ফায়দা সর্বব্যাপী। কারণ এ মজলিস যদিও সাধারণ মুসলমানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে কিন্তু শ্রোতাদের অধিকাংশ থাকেন আলেম। যার দরুণ এ বয়ানগুলো সাথে সাথে সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে পুস্তক আকারে ছাপিয়ে প্রচার করা হয়। ফলে অল্প সময়েই তার ফয়েয পাক সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মুসলমানদের নিকটও পৌঁছে যায়।

স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগিতা অনুধাবন, অকৃত্রিম ও ইখলাসপূর্ণ বিনয়ী উপস্থাপনা, প্রতিটি সমস্যার যথাযথ বিশ্লেষণ, তুলনামূলক সহজ ও গ্রহণযোগ্য সমাধান, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেবের বয়ান ও রচনা বৈশিষ্ট্য। যার দরুন তার নতুন কিতাব কিংবা বয়ান প্রকাশ হলে খুব দ্রুতই তা নিঃশেষ হয়ে যায়।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব রচিত কিতাব পাঠ করে এবং তাঁর বয়ান শুনে হাজারো পথহারা মানুষ আল্লাহপ্রাপ্তির সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে। যার দরুন অনেকেই তাকে হযরত থানভী (রহঃ)-এর এ যুগের ভাষ্যকার নামে আখ্যায়িত করেছেন।

এ বৎসরের শুরুতে একটি ইসলামী সেমিনারে যোগদানের জন্য যখন হযরত বাংলাদেশে তাশরীফ আনেন, তখন কয়েক দিন হযরতের একান্ত সান্নিধ্যে কাটানোর সৌভাগ্য হয়, সে সময় অন্তরের গভীরে সযত্নে লুকিয়ে রাখা কয়েকটি বাস্তব অথচ স্পর্শকাতর সমস্যার কথা হযরতকে খুলে বললে তিনি তার এমন

সহজ-সুন্দর, বাস্তব ও সময়োপযোগী সমাধান দেন যে, সে উত্তরে অন্তরের সকল ব্যথা দূরীভূত হয় এবং হযরতের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মহব্বত কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

এক পর্যায়ে 'মাকতাবাতুল আশরাফ' থেকে প্রকাশিত হযরতের বয়ান ও কিতাবের অনূদিত বেশ কিছু পুস্তক হযরতের খেদমতে পেশ করলে তিনি খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং মাকতাবাতুল আশরাফ ও অধমের জন্য দু'আ করেন। আমি সুযোগ বুঝে হযরতের খেদমতে আরয করি আমরাতো হযরতের সকল কিতাবের অনুবাদেরই আশা রাখি তবে হযরতের দৃষ্টিতে কোনটির অনুবাদ আগে হওয়া দরকার। তখন হযরত বলেন, 'ইসলাহী খুতবাত' এর অনুবাদ আগে হওয়া দরকার। কারণ এটা সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য উপযোগী। হযরতের এ নির্দেশনার বাস্তবরূপ 'গোনাহ ও তাওবা অভিশাপ ও রহমত'। আমরা ইনশাআল্লাহ যত দ্রুত সম্ভব হযরতের সকল রচনা ও বয়ানের অনুবাদ প্রকাশ করবো।

অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারুক অনুবাদ ও রচনার জগতে একান্তই নবীন। তবে তার ইখলাস, আগ্রহ ও নিরবিচ্ছিন্ন মেহনত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সাক্ষ্য বহন করে। আমি তার অনুবাদকে যথাসাধ্য সবল করার চেষ্টা করেছি এবং এ পর্যায়ে আরেক খোদাপ্রেমিক জনাব শ্রদ্ধেয় আমানত ভাইয়ের সাহায্যও নিয়েছি। তিনি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একটি প্রুফ দেখে দিয়ে অনেক অসঙ্গতি দূর করে দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। বইটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠক সবাইকে আল্লাহ তাঁর নাফরমানী তথা গোনাহ থেকে বেঁচে থেকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

নিবেদক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তারিখ: পহেলা জুমাদাল উলা
১৪২২ হিজরী

বিসমিহি তা'আলা

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের অধিপতি। শত-সহস্র দুরূদ ও সালাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি সমগ্র জগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ দুনিয়ায় তার প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদেরকেই বানিয়েছেন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জাতি। সেই সৃষ্টির সেরা মানব জাতি কোন কোন সময় পাপের আঁধারে নিমজ্জিত হয়ে জীবনকে করে কলুষিত। ফলে সে দিশেহারা হয়ে কলংকিত জীবন যাপন করতে শুরু করে। গোনাহ করার পর অনুতপ্ত হওয়া ভাল কিন্তু নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা একথা ভালভাবেই জানেন যে, মানুষ শুধু ইবাদাতই করবে না মাঝে-মধ্যে গোনাহের কাজেও জড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ পাকের যদি শুধু ইবাদতই উদ্দেশ্য হতো, তবে মানুষ সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এর জন্য ফেরেশতারাই যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তা'আলা চান যে, তাঁর বান্দা গোনাহও করবে আবার তাঁর নিকট ক্ষমাও চাইবে। তিনিই তাদের ক্ষমা করে দিবেন। যেমন, এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা যদি গোনাহকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়া থেকে তোমাদের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দিয়ে এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গোনাহও করবে এবং স্বীয় প্রভুর নিকট ক্ষমাও চাইবে। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ থেকে এ দুনিয়ায় গোনাহর প্রকাশ ঘটবেই। এতে নিরাশ ও দিশেহারা হওয়া উচিত নয় তবে অনুতপ্ত হতে হবে। গোনাহের এ কালিমা থেকে পাক-সাফ হওয়ার পথটির নামই হচ্ছে 'তাওবা'।

অনেক দিন থেকে ভাবতাম– এ বিষয়ের উপর কিছু পড়া-শোনা করবো এবং নিজের গোনাহ-কলুষিত জীবনকে পবিত্র করে আল্লাহ পাকের রহমত

সিক্ত বান্দাদের তালিকাভুক্ত হবো। তাই এক দিন আমার মুরুব্বীতুল্য ব্যক্তিত্ব তাঁতী বাজার ইসলামিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস, মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্ত্বাধিকারী, জনাব মাওলানা হাবীবুর রহমান খান সাহেবের নিকট আমার এই আগ্রহের কথা ব্যক্ত করলাম। তিনি আমার এ আগ্রহকে খুবই মূল্য দিলেন এবং আমাকে আল্লামা তাকী উসমানী (দাঃ বাঃ)-এর ধারাবাহিক বয়ান 'এসলাহী খুতবাত' এর মধ্য থেকে 'গোনাহ ও তাওবা' সংক্রান্ত বিষয়গুলো পাঠ করার এবং একই সাথে তা অনুবাদ করার প্রস্তাব দেন। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে পড়া ও অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ করে পান্ডুলিপিগুলো তাঁর হাতে তুলে দিই। তিনি শত ব্যস্ততার ভিতর দিয়েও আমার কাঁচা হাতের অনুবাদগুলো সংশোধন করেন এবং তিনি নিজেই তা প্রকাশের জন্য এগিয়ে আসেন। আমি তাঁর কাছে ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন।

লেখালেখির জগতে আমি খুবই নবীন। তবে অনুবাদককে মূলানুগ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবুও যদি কোন ভুল হয়ে থাকে জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হবো।

অবশেষে আল্লাহর দরবারে এ দু'আ চেয়ে বিদায় নিচ্ছি যে, হে প্রভু! তুমি এর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক সবাইকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের সকলকে গোনাহের আগ্রাসন থেকে বাঁচিয়ে রেখো। আর যদি কখনও লিপ্ত হয়েও যাই, তবে তোমার নিকট তাওবা করার তাওফীক দিও। আমীন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে গোনাহের অভিশাপ থেকে হেফাজত করুন। আর কখনো ভুলে গোনাহে লিপ্ত হলে, তাওবার রহমতের বারী ধারায় সিক্ত করে পবিত্র হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ ওমর ফারুক
বড় কাটরা মাদ্রাসা, ঢাকা

তারিখঃ পহেলা জুমাদাল উলা
১৪২২ হিজরী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দিন একশত বার তাওবা করতেন

গোনাহ্ ও তাওবা
অভিশাপ ও রহমত

بسم الله الرحمن الرحيم

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দিন একশত বার তাওবা করতেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ!

وعن الاغر المزنى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه ليغان على قلبى حتى استغفر الله فى اليوم مأة مرة

অর্থঃ হযরত আগার মাযনি (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'কখনও কখনও আমার মনে গোনাহের স্পৃহা জাগে, এমনকি আমি প্রতিদিন আল্লাহর দরবারে একশত বার এস্তেগফার করি।'

চিন্তা করে দেখুন একথাটি কে বলছেন? সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাকে আল্লাহ তা'আলা গোনাহ থেকে পাক-পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন। যার

থেকে কোন গোনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। আর যদি তাঁর পক্ষ থেকে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়েও থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সব ধরনের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَخَّرَ (سورة الفتح: ٢)

অর্থঃ যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। (সূরা আল ফাতাহ, আয়াত– ২)

আল্লাহপাকের এ ঘোষণা সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমি প্রতি দিন একশতবার তাওবা করি।' উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, হাদীছে উল্লেখিত "একশত বার" দ্বারা সংখ্যা উদ্দেশ্য নয় বরং তাওবার আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য।

গোনাহের স্বাধ সবার-ই জাগে

উল্লেখিত হাদীছে তাওবার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি এজন্য তাওবা করি যে, আমার মনে কখনও কখনও গোনাহের আগ্রহ সৃষ্টি হয়', অর্থাৎ মানুষ হিসেবে একজন নবীর মনেও গোনাহের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক। মানুষ তাকওয়া ও বুযুর্গীর যত উচ্চ স্তরেই উত্তীর্ণ হোক না কেন, গোনাহের আকর্ষণ থেকে বাঁচতে পারবে না। কখনও মানুষ থেকে সম্পূর্ণ রূপে গোনাহের স্বাধ ও আকর্ষণের সমাপ্তি ঘটতে পারে না। তবে হ্যাঁ গোনাহের শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণেই যদি কোন ব্যক্তি বছরের পর বছরও কোন বুযুর্গের সংশ্রবে থাকে এবং সংশ্রবে থেকে যা কিছু অর্জন করার তাও অর্জন করে ফেলে এবং এক্ষেত্রে সে উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌছে যায়। অন্তরে আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কও হয়ে যায়। এতকিছু হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে তার নফসের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এমন যেন মনে না আসে যে, আরে আমিতো এখন শায়েখ হয়ে গেছি। আর শায়েখ থেকে এজাজতও পেয়ে গেছি। তাই

এখন আর নিজের নফসের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার কোন প্রয়োজন নেই। এখন নফস ও শয়তান আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

তবে হ্যাঁ নবীগণ এর উর্ধ্বে। তাঁদের সেই সুমহান মর্তবা পর্যন্ত কেউ পৌছতে সক্ষম হবে না। সুতরাং বুঝা যায় যে, মানুষ যত বড় ওলী, সূফী, মুত্তাকী এবং পরহেযগারই হোক না কেন গোনাহের আকর্ষণ থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু পার্থক্য হল এটুকু যে, আমাদের মত গোনাহগার যারা গোনাহের এ ভয়ংকর থাবার শিকার হয়ে পড়ি। তারা গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যাই। কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন, আল্লাহর মেহেরবাণী ও মুজাহাদার দরুণ তাদের গোনাহের শক্তিগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাই গোনাহের আকর্ষণ তাদের উপর প্রবল হতে পারে না। যার ফলে গোনাহের আগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও তারা গোনাহ থেকে বাঁচতে সক্ষম হন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا (سورة يوسف ٢٤)

অর্থাৎ, জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ)কে গোনাহের কাজের প্রতি ডেকেছিল এবং তার মনেও গোনাহের খেয়াল এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে গোনাহ থেকে হেফাজত করেছেন। তাই আত্মশুদ্ধি ও তরীকতের ব্যাপারে এ ধরনের ধারণা রাখা ঠিক নয় যে, এ স্তরে পা রাখতে পারলেই মানুষ থেকে সব ধরনের ভুল-ভ্রান্তি ও গোনাহ দূরীভূত হয়ে যায়। গোনাহের খেয়াল অন্তরে আর আসে না। তবে হ্যাঁ মুজাহাদা ও আত্মশুদ্ধির কারণে গোনাহের আকর্ষণ কমে যায়। যার ফলে নফসের কু-প্রবৃত্তির মুকাবিলা করা সহজ হয়ে পড়ে এবং নফস তার উপর প্রবল হতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা করা নিতান্তই ভুল যে, মুজাহাদা করার পর অন্তরে আর গোনাহের আগ্রহ জাগবে না। এমনটি কস্মিনকালে ও হতে পারে না।

মানুষ হিসেবে অন্তরে গোনাহের স্বাধ জাগাটা স্বাভাবিক। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا (سورة الليل ٨)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি মানুষের অন্তরে গোনাহের আকর্ষণও দিয়েছি এবং তাকওয়ার প্রতি ধাবিত হওয়ার যোগ্যতাও দিয়েছি।

(সূরা শামস, আয়াত ৮)

অর্থাৎ মানুষের মনে গোনাহের আকর্ষণও হবে আবার সৎকাজের স্বাধও জাগবে। আর এর ভিতরেই রয়েছে মানুষের জন্য পরীক্ষা। যদি মানুষের অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে গোনাহের চাহিদা দূর হয়ে যায়, তাহলে আর গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার ভিতর মানুষের জন্য কি কৃতিত্ব আছে? নফস এবং শয়তানের সাথে তার কি বিষয়ে মুকাবিলা হবে এবং সে জান্নাত-ই বা পাবে কিসের বিনিময়ে? কারণ জান্নাততো দেয়া হবে এমন কাজের বিনিময়ে যা করতে মন চাইবে না কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পন্ন করে যাবে। আর তখনি মানুষের ঈমানের পূর্ণতা প্রকাশ পাবে।

হযরত শেখ সাদী (রহঃ) বলেন–

وقت پیری گرگ ظالم میشود پرهیزگاری
در جوانی توبه کردن شیوئے پیغمبری

অর্থাৎ, বৃদ্ধ বয়সেতো জালেম-হিংস্র বাঘও পরহেযগার ও মুত্তাকী হয়ে যায়। কারণ এ সময় না মুখে দাঁত থাকে, আর না পেটে আঁত থাকে। তখন তার জুলুম করার আর কোন শক্তি থাকে না। সুতরাং তখন সে পরহেজগার না হয়ে, হবেটা কি? পক্ষান্তরে নবীগণের অভ্যাস হল যুবক বয়সেই তাওবা করে ফেলা। যখন গোনাহের শক্তি-সামর্থ থাকে, অন্তরে আকর্ষণও থাকে। গোনাহ করার সুযোগ-সুবিধাও থাকে। এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা, গোনাহ পরিহার করা শুধু আল্লাহর ভয়েই হয়ে থাকে। আর এটাই হল নবীগণের অভ্যাস বা রীতি-নীতি।

বুযুর্গদের সংশ্রব

কোন কোন মানুষ মনে মনে এ আকাংখা করে যে, যদি কোন বুযুর্গ আমার উপর নেক দৃষ্টি করতো। যদি তার বুকের সাথে আমার বুক মিলাতে পারতাম, তার বুক থেকে কিছু নূর আমার বুকে প্রবেশ করত, তাহলে আমার অন্তর থেকে গোনাহের সব আকর্ষণ শেষ হয়ে যেত।

মনে রাখবেন! এটা অলিক ধারণা মাত্র বাস্তব নয়। যে এ ধারনায় আছে, সে সম্পূর্ণ ভুলের মধ্যে আছে। যদি সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া এমনই হতো তবে দুনিয়ার মাঝে কোন কাফের থাকতো না। কারণ তাদের সাথে মুসলমানদের দেখা-শুনা, চাল-চলন সদা-সর্বদাই হয়ে থাকে।

হযরত থানভী (রহঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন, 'হুযূর! আমাকে কিছু নসীহত করুন।' হযরত থানভী (রহঃ) তাকে কিছু নসীহত করে দিলেন। বিদায় নেয়ার সময় সে বলল, 'হুযূর! আপনার বুক থেকে আমাকে কিছু দান করুন।' তার উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত থানভী (রহঃ)-এর বুক থেকে কিছু নূর তার বুকে চলে আসুক। যার ফলে তার গোনাহের সকল আকর্ষণের সমাপ্তি ঘটবে। আখেরাতে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়ে যাবে। উত্তরে হযরত থানভী (রহঃ) বললেন, 'আমি আমার বুক থেকে তোমাকে কি দেব? আমার বুকে তো আছে কিছু 'কফ' যদি চাও নিয়ে যাও।'

সারকথা এই যে, ধারণা করা হয় যে, কোন বুযুর্গের নেক দৃষ্টি পড়লে, বুক থেকে নূর আসলে, নিজের গোনাহের সমস্ত খাহেশ বিদায় নিবে। গোনাহের কোন আগ্রহ থাকবে না। এসব একেবারে কাল্পনিক এবং অবাস্তব।

ایں خیال است و محال است وجنون

এটা এক অবাস্তব ধারণা মাত্র, যা অসম্ভব এবং পাগলামী। তবে হাঁ এ কথাটি চীর সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা বুযুর্গদের সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া রেখেছেন। যে তাঁদের সংশ্রবের কারণে মানুষের চিন্তা-চেতনার রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। যার ফলে মানুষ সঠিক পথে চলতে শিখে। কিন্তু সমস্ত কাজ নিজের-ই করতে হবে। নিজেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে।

এক কাঠুরিয়ার ঘটনা

হযরত আল্লামা রুমী (রহঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ 'মসনবী শরীফে' একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, এক কাঠুরে বন থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করত। আর এভাবেই তার সংসার চলতো।

একদিন সে বন থেকে কাঠ কেটে নিয়ে এলো। তার অজান্তে কাঠের সঙ্গে করে একটি বড় সাপও বেঁধে নিয়ে এলো। কিন্তু বাড়িতে এনে দেখার পর মনে হল, এটি একটি মৃত সাপ। তাই কেউ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলো না। একে ঘরের ভিতরেই ফেলে রেখে দিলো। তারা মনে করল যেহেতু এটি মৃত তাই কিছু করতে পারবে না। সুতরাং বাইরে ফেলার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন সে সাপের গায়ে রোদ্রের তাপ লাগল তখন সে সুস্থ হয়ে নড়া-চড়া আরম্ভ করল। অতঃপর ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। সে কাঠুরে বেচারা ছিল ঘুমে অচেতন। এ অবস্থায় সাপ গিয়ে তাকে দংশন করল। এখন ঘরের সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। বলে উঠলো হায়! যে সাপকে আমরা মৃত মনে করেছিলাম, সে সাপ যিন্দা হল কিভাবে? কিভাবে এ দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

মাওলানা রূমী (রহঃ) এ ঘটনা দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মানুষের নফসের অবস্থাও অনুরূপ। যখন কোন আল্লাহওয়ালার সোহবতে যায়, মুজাহাদা ও সাধনা করে তখন তার গোনাহের খাহেশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মনে হয় যেন মরে গেছে। কিন্তু বাস্তবে সে মরেনি। যদি মানুষ তা থেকে গাফেল ও অচেতন হয়ে পড়ে, তবে সে দুর্বল নফস যে কোন সময় সবল হয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। রূমী (রহঃ) আরো বলেন–

نفس ازدها است اوکے مردہ است از غم بے التی افسردہ است

অর্থাৎ, মানুষের নফস অজগর সাপের ন্যায়। যা বাস্তবে মরেনি। কিন্তু মুজাহাদা ও সাধনার প্রভাব যেহেতু তার উপর পড়েছে তাই সে মৃত প্রায় হয়ে পড়েছে। কিন্তু যে কোন সময় সে সুস্থ হয়ে তোমাকে দংশন করতে পারে। তাই এর ক্ষতি সম্পর্কে গাফেল হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ যেমনিভাবে নফস এবং শয়তান নামক দুইটি বিষ দাত সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষকে চিরতরে অশান্তির কারাগারের দিকে নিয়ে যায়; তেমনিভাবে এ দু'টির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তো এ ধারণা করা ভূল যে, তিনি দু'টি বিষাক্ত বস্তু সৃষ্টি করবেন, কিন্তু সেগুলোর প্রতিষেধক সৃষ্টি করবেন না।

আল্লাহ তা'আলা সে বিষের প্রতিষেধক এত মজবুত করে বানিয়েছেন যে ক্ষণিকের মধ্যে সে বিষের প্রতিক্রিয়াকে বিনষ্ট ও নিস্তেজ করে দিতে পারে। আর সে প্রতিষেধক হল তাওবা ও এস্তেগফার। সুতরাং যখনই নফস নামক সাপ তোমাকে দংশন করে ফেলবে বা দংশন করতে চাইবে তখনই তুমি পড়ে নিবেঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوبُ إِلَيْهِ

এ প্রতিষেধক বিষের প্রতিক্রিয়াকে নিমিষের মধ্যেই শেষ করে দিবে। তাই একথা বলতেই হবে যে, যত রোগই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, সাথে সাথে সেগুলোর প্রতিষেধকও সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

কুদরতের কারিশমা

আমি একবার দক্ষিণ আফ্রিকার 'কেপটাউন' এলাকা থেকে রেলগাড়ীতে সফর করছিলাম। রাস্তায় এক স্থানে গিয়ে গাড়ী থামল। আমি নামায পড়ার জন্য নিচে নামলাম। তখন সেখানে খুব সুন্দর একটি চারা গাছ দেখতে পেলাম। তার পাতাগুলোও ছিল দেখতে খুব সুন্দর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন চাইল যে, সে চারা গাছটি তুলে নেই। কাজেই তা তুলে নেয়ার জন্য যখনই হাত বাড়ালাম, সাথে সাথে আমার সফর সঙ্গী সজোরে চিৎকার করে বলে উঠল, হযরত! এতে হাত লাগাবেন না। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কেন? তিনি উত্তর দিলেন এটা খুব বিষাক্ত গাছ, দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু এর বিষক্রিয়া এমন মারাত্মক যে, যদি কেউ তা স্পর্শ করে তবে তার সারা শরীরে বিষ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, কাউকে সাপ বা বিচ্ছু দংশন করলে যেমন বিষ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। আমি বললাম, আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমি এতে হাত লাগাইনি। কিন্তু ভয় হচ্ছে যে, যদি কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি এসে এতে হাত লাগায় তবে তো সে মুসীবতে পড়ে যাবে। আমার এ কথা শুনে তিনি আরও আশ্চর্যজনক কথা শুনালেন যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কারিশমা। আর তা এই যে, যে কোন স্থানেই এ বিষাক্ত গাছটি রয়েছে ঠিক তার পাশেই এর প্রতিষেধক আরেকটি গাছও জন্মাবে। যদি কখনও কেউ এ বিষাক্ত গাছ স্পর্শ করার

কারণে বিষে আক্রান্ত হয়, তখন সাথে সাথে পাশের সেই গাছটিতে হাত লাগালেই সে বিষের সব প্রতিক্রিয়া নিমিষেই খতম হয়ে যায়। এ গাছটি-ই হল সে বিষের প্রতিষেধক।

ঠিক তেমনই অবস্থা হল আমাদের গোনাহ ও তাওবার। সুতরাং যখনই কোন ব্যক্তি গোনাহের বিষে আক্রান্ত হবে, সাথে সাথে সে যেন এস্তেগফারের প্রতিষেধকও ব্যবহার করে নেয়। তাহলে সাথে সাথে গোনাহের বিষ দূরীভূত হয়ে পড়বে এবং সে ব্যক্তিও পবিত্র হয়ে যাবে।

প্রতিনিধিদেরকে প্রতিষেধক দিয়েই প্রেরণ করা হয়েছে

আমাদের শায়েখ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী (রহঃ) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের ভিতর গোনাহের স্পৃহা দিয়েছেন। আবার সেই মানুষকেই বানিয়েছেন তাঁর খলীফা। আর যাদের মধ্যে গোনাহের আগ্রহ দেননি তাদেরকে খলীফাও বানাননি। যেমন, ফেরেশতাদের ভিতরে আল্লাহ তা'আলা গোনাহের আগ্রহ দেননি। আর তাদেরকে জমিনের খলীফাও বানাননি। মানুষের ভিতরে গোনাহের আগ্রহ দিয়ে দুনিয়ার দিকে পাঠানোর আগে দৃষ্টান্তমূলকভাবে তার থেকে একটি গোনাহও করিয়েছেন। যখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)কে বেহেশতে পাঠান তখন বলে দিয়েছিলেন যে, জান্নাতের যেখানেই তোমার মন চায় সেখানেই ঘুরে বেড়াও। ফল-ফলাদি ভক্ষণ কর। আমোদ-প্রমোদ কর, তবে এ গাছটি থেকে কোন ফল খেতে যেওনা। এরপর শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করল এবং হযরত আদম (আঃ)কে ধোঁকা দিল। যার ফলশ্রুতিতে তিনি নিষিদ্ধ এ গাছটি থেকে ফল খেয়ে ফেললেন। তাঁর থেকে এ ত্রুটিটুকু সাব্যস্ত হয়ে গেল। বাস্তবে কিন্তু এ ত্রুটি তাকে দিয়ে করানো হয়েছে। কারণ কোন কাজই তো আল্লাহ তা'আলার হুকুম ব্যতীত হয় না। কিন্তু এ ত্রুটি হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে দুঃশ্চিন্তা ও লজ্জার ছাপ পড়ে গেল এবং বলে উঠলেন, হে প্রভু! আমার দ্বারা এ ভুলটি কিভাবে হয়ে গেল আমি বুঝতে পারিনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, তুমি এ বাক্যগুলো বলঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থাৎঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজে নিজের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা ও দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। (সূরা আরাফ, আয়াত-২৩)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে এ দু'আ শিক্ষা দিয়ে তার মুখ থেকে এ বাক্যগুলো উচ্চারণ করানো ব্যতিরেকেই তাকে ক্ষমা করে দিতে পারতেন এবং বলতে পারতেন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এমনটি করেননি। এর কারণ আমাদের শায়খ ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এসব করিয়ে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, দেখ! তোমরা দুনিয়াতে বসবাস করতে যাচ্ছ। সেখানে গোনাহ হবে, ভুল-ত্রুটি হবে, শয়তান ধোঁকা দিবে। সুতরাং যদি তোমরা এগুলোর প্রতিষেধক না নিয়ে যাও, তবে সঠিকভাবে জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না। আর তোমাদের সেই প্রতিষেধক হচ্ছে তাওবা ও এস্তেগফার। উভয়টি শিক্ষা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বললেন, যাও! এবার দুনিয়াতে যাও। এই প্রতিষেধক যা খুবই সহজ। কেবল মাত্র অন্তর দিয়ে যবান থেকে উচ্চারণ করলেই সব গোনাহ ও ভুল-ত্রুটি মাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তাওবা তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত

তাওবাই হল আসল। আর এস্তেগফার হল তাওবার দিকে যাওয়ার পথ। তাওবা তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। (এক) যে ত্রুটি বা গোনাহ হয়েছে তার উপর খুব লজ্জিত হওয়া। (দুই) যে গোনাহ হয়ে গেছে তা তাৎক্ষণিকভাবে পরিহার করা। (তিন) ভবিষ্যতে আর এ ধরনের গোনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। যখন এই তিনটি বস্তুর সমন্বয় ঘটবে তখনই তাওবা পরিপূর্ণ হবে। আর যখন কোন ব্যক্তি গোনাহ থেকে আন্তরিকভাবে তাওবা করে নেয়, তখন সে গোনাহ থেকে পাক-সাফ হয়ে যায়। যেমন হাদীছ শরীফে এসেছেঃ

التائب من الذنب كمن لاذنب له

অর্থাৎ, গোনাহ থেকে তাওবাকারী এমন যেন, সে কোন গোনাহই করেনি। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুল করে নিয়েছেন এবং আমলনামায় লিখে দিয়েছেন যে, অমুক বান্দা অমুক গোনাহ করেছে কিন্তু তা মাফ করে দেয়া হয়েছে, শুধু তাই নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমত ও দয়ায়, গোনাহ লিখিত সে দফতরটিকেও মিটিয়ে দেন এবং আখেরাতে এ লেখা থাকবে না যে, অমুক বান্দা অমুক সময় অমুক গোনাহ করেছিল। আমি আমার শায়েখ থেকে একটি কথা শুনেছি, তবে এটা কোন কিতাবে আমি পাইনি। তাহলো তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই দু'জন করে ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছেন। যাদেরকে কেরামান-কাতেবীন বলা হয়। একজন থাকেন ডান কাঁধে, যিনি নেক আমলসমূহ লিখেন। আরেকজন থাকেন বাম কাঁধে, যিনি বদ আমলসমূহ লিখেন। তবে আল্লাহ তা'আলা ডান দিকের ফেরেশতাকে বাম দিকের ফেরেশতার আমীর নিযুক্ত করেছেন। (কারণ আল্লাহ তা'আলার হুকুম হল– যখন তোমরা দু'জন মিলে কোন কাজ করবে, তখন একজন হবে আমীর আর অন্যজন হবে মা'মুর) তাই যখনই মানুষ কোন নেক আমল করে ডান দিকের ফেরেশতা সাথে সাথে তা লিপিবদ্ধ করে ফেলে। যেহেতু তিনি আমীর তাই নেক আমল লিখতে গিয়ে বাম দিকের ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয় না। আর বাম দিকের ফেরেশতা যেহেতু ডান দিকের ফেরেশতার অধীন তাই যখন কোন বান্দা বদ আমল করে তখন তা লিখতে গিয়ে তাঁকে ডান দিকের ফেরেশতার নিকট জিজ্ঞাসা করতে হয়। তাই তিনি ডান দিকের ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করেন, অমুক বান্দা অমুক গোনাহ করেছে এখন কি তা লিখে নেব?

তখন ডান দিকের ফেরেশতা উত্তর দেন যে, না এখন লিখো না। হতে পারে সে বান্দা তাওবা করে নিবে। যদি তাওবা করে নেয় তবে

আবার মিটিয়ে দেয়ার ঝামেলায় পড়তে হবে। তাই একটু অপেক্ষা কর। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞাসা করে এবার লিখবো? তখন তিনি উত্তর দেন, না, আরো একটু অপেক্ষা কর। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞাসা করে এবার লিখবো কি? এ পর্যন্ত যদি বান্দা তাওবা না করে থাকে তবে বলেন, এবার লিখে নাও।

শতবার তাওবা ভঙ্গ করলেও ফিরে আস

আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি খুব দয়াশীল। করুণার আধার। বান্দা গোনাহ করার পর তাকে সুযোগ দিয়ে রাখেন যেন সে তাওবা করে নেয়, ক্ষমা চেয়ে নেয়। যেন তার আমলনামায় এটা আর লিপিবদ্ধ করা না হয়। কিন্তু কোন বান্দা যদি তাওবা না করে তখন লিখে দেয়া হয়। কিন্তু সে লেখার পরেও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বান্দার জন্য তাওবার দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়। বান্দা যখনই চায় তাওবা করে নিতে পারে। নিজের আমলনামা থেকে গোনাহ মিটিয়ে নিতে পারে। যদি একটিবারের জন্যও অন্তর দিয়ে তাওবা করে নেয়, তবে তার আমলনামা থেকে সব গোনাহ চিরতরে মিটিয়ে দেয়া হয়। তবে যদি আজরাঈল (আঃ) এসে পড়ে এবং মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে শুরু করে। তখন আর সে সময় তাওবা করে কোন ফায়দা হবে না। এর আগ পর্যন্ত যত বড় গোনাহগার হোক যে কোন সময় তাওবা করে নিতে পারে। সে সুযোগ আল্লাহ তা'আলা দিয়ে রেখেছেন।

بازآ بازآ هر آنچه هستی باز آ
گر کافر وگر و بت پرستی باز آ

অর্থাৎ ফিরে এসো, ফিরে এসো, যত বড় অন্যায়কারীই হও না কেন, যদি কাফের বা অহংকারী বা মূর্তিপূজকও হয়ে থাক তবুও ফিরে এসো।

ایں درگاه مادرگاه نو امیدی نیست
صدبار گر توبه شکستی بازآ

অর্থাৎ এটা এমনই দরবার, যেখান থেকে মানুষ বঞ্চিত হয় না, শতবারও যদি তাওবা ভঙ্গ করে থাকো তবুও ফিরে এসো।

গোনাহে লিপ্ত হওয়ার ভয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিপরীত নয়

আমাদের একজন বুযুর্গ, যার নাম বাবা নাজম আহসান (রহঃ)। তিনি হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)–এর খলীফা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে অগাধ জ্ঞান দান করেছিলেন। তার সাথে যাদের সম্পর্ক আছে তারাই তা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি একদিন তাওবা সম্পর্কে বয়ান করছিলেন। আমি তাঁর পাশে-ই বসা ছিলাম। তার বয়ান চলাকালে এক যুবক কোন প্রয়োজনে তার দরবারে এসে উপস্থিত হল। যেহেতু আল্লাহ ওয়ালারা সদা-সর্বদা মানুষকে শিক্ষা দান এবং সংশোধন করার চিন্তা করে থাকেন, তাই তিনি সে যুবককে লক্ষ্য করে বললেনঃ আরে মিয়া! মানুষ মনে করে দ্বীন খুব কঠিন জিনিস। আসলে দ্বীন কোন কঠিন বিষয় নয়। রাতে বসে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নাও ব্যস! এটাই পরিপূর্ণ দ্বীন। যখন সে যুবক চলে গেল আমি বললামঃ হযরত! আপনার কথাতো খুবই মূল্যবান তবুও আমার মনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হচ্ছে। যার কারণে আমি অস্থির হচ্ছি। তখন তিনি বললেন, বল! তোমার প্রশ্নটা কি? তখন আমি বললাম, হযরত! তাওবার তিনটি শর্ত রয়েছে। (এক) আন্তরিকভাবে লজ্জিত হওয়া। (দুই) সাথে সাথে ঐ কাজ পরিহার করা। (তিন) ভবিষ্যতে কখনও আর সে কাজ না করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। প্রথম দু'টি কাজতো খুবই সহজ। কিন্তু তৃতীয় কাজ অর্থাৎ ভবিষ্যতে এ কাজ আর করবো না এটাতো খুবই কঠিন। কারণ সঠিকভাবে বলা তো যায় না যে, ভবিষ্যতে করবে কি–না? সুতরাং যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পাওয়া যায়নি তাওবাও সঠিক হয়নি। আর যখন তাওবা সঠিকভাবে হয়নি তখন বান্দার গোনাহ বাকী থাকবে এবং মাফ না হওয়ার চিন্তায় অস্থিরও থাকতে হবে। তখন বাবা নাজম আহসান (রহঃ) উত্তর দিলেন, যাও মিয়া! তুমি তো 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞা'র অর্থই বুঝোনি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অর্থ হল, নিজের পক্ষ থেকে এ ইচ্ছা করা যে, ভবিষ্যতে কখনও আর এ ধরনের কাজ করবো না। এখন যদি এ প্রতিজ্ঞা করার সময় মনে ধাক্কা লাগে ও ভয় আসে যে, আমি কি এ প্রতিজ্ঞার উপর অটল থাকতে পারবো? তবে এ ভয়ের কারণে তাওবার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু শর্ত হলো যে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কঠোরভাবে

করতে হবে। আর অন্তরে গোনাহের যে ভয় হয়, তার চিকিৎসা হলো, তাওবা করার সাথে সাথে এ দু'আও করতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমিতো তাওবা করছি যে, ভবিষ্যতে কখনও এ কাজ করবো না। তবে আমি কে? আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও বা কি? আমিতো দুর্বল। জানিনা এ দৃঢ়তার উপর অটল থাকতে পারবো কিনা? তবে আল্লাহ তুমি যদি এর উপর থাকার তাওফীক দাও তবেই আমি থাকতে পারবো। সুতরাং তুমি আমাকে তাওফীক দাও। যখন এভাবে দু'আ করবে, তখন দেখবে গোনাহের এ ভয় দূরীভূত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সত্যিই যখন থেকে হযরত বাবা নাজম (রহঃ) একথা বললেন, তখন থেকেই আমার অন্তর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

নিরাশ হইও না

হযরত সিরী সিকতী (রহঃ) যিনি অনেক বড় বুযুর্গ এবং হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) এর শায়েখ ছিলেন। তিনি বলতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার অন্তরে গোনাহের ভয় থাকে এবং গোনাহ করার পর অন্তরে লজ্জার সৃষ্টি হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিরাশ হইও না। হ্যাঁ যদি অন্তর এমন পাষান হয়ে পড়ে যে, গোনাহের প্রতি কোন ভয় হয় না, গোনাহ করার পর অন্তরে লজ্জাও আসে না, গোনাহ করতে গিয়ে বাহাদুরী প্রদর্শন করো এবং গোনাহকে জায়েয করার বাহানা তালাশ করো তবে তা মারাত্মক ব্যাপার (আল্লাহ এ থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন)। কিন্তু যদি অন্তরে লজ্জা অনুভব হয়, তবে ভয়ের কোন কারণ নেই।

سوئے نو امیدی مرو کہ امیدها ست
سوئے تاریکی مرو کہ خور شیدها ست

অর্থাৎঃ নিরাশার দিকে যেও না, কারণ আশা-আকাঙ্খার অসংখ্য রাস্তা আছে; অন্ধকারের দিকে যেওনা। কারণ আলোর জন্য অসংখ্য সূর্য রয়েছে। সুতরাং তাওবা করে নাও সব গোনাহ শেষ হয়ে যাবে।

আর আল্লাহ তা'আলা যখন তাওবার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন, তখন নিরাশ হওয়ার অর্থ কি? অনেক সময় আমাদের অন্তরে একথা আসে যে,

হায়! আমিতো নাফরমান হয়ে গেছি। আমি কোন আমল করছি না, আমি গোনাহে লিপ্ত আছি। সাধারণতঃ এ সমস্ত খেয়াল অন্তরে আসার পরই নিরাশার সৃষ্টি হয়।

মনে রাখবেন! নিরাশ হওয়াটা শয়তানের একটি ধোঁকা। শয়তান নিরাশার চারা অন্তরে বপন করে আমল করা থেকে বিরত রাখতে চায়। যে বান্দার মালিক এত রাহীম, রহমান, যিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাওবার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন এবং যিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, যত বড় গোনাহই হোকনা কেন তাওবা করলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। এরপরেও কি বান্দা নিরাশ হতে পারে? কখনও নয়। নিরাশ হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। ব্যাস! অন্তর দিয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে হবে তাহলে সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। কারণ গোনাহর কোন স্থায়িত্ব নেই। মানুষ যত বেশী গোনাহ, যত বড় গোনাহ করুক, তাওবার দ্বারা সবকিছু এক মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। একথাটি বুঝাতে গিয়ে বাবা নাজম আহসান (রহঃ) বলেন–

دولتیں مل گئیں ہیں انہوں کی

ایسی تیسی میرے گناہوں کی

অর্থাৎঃ যখন আল্লাহ তা'আলা ক্রন্দন ও আহাজারী করার মত যোগ্যতা দিয়েছেন, যা অন্তরে লজ্জা অনুভব হওয়ার ফলে যবান দিয়ে প্রকাশ পায়। আর মানুষ যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিজের গোনাহ মাফ চায়। তবে গোনাহ আমাদের কি ক্ষতি করতে পারবে? সুতরাং যখন তাওবার পথ খোলা আছে, তবে আর নিরাশ হওয়ার কারণ কি?

তাওবার অর্থ

তবে তাওবার ভিতরে তিনটি বস্তু অবশ্যই পাওয়া যেতে হবে। যা ব্যতীত তাওবা পরিপূর্ণ হয় না। অপর একটি জিনিস হলো 'এস্তেগফার' এস্তেগফার সাধারণতঃ 'তাওবা'র তুলনায় ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। 'এস্তেগফার' এর অর্থ হচ্ছেঃ আল্লাহর নিকট গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য দু'আ করা। আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা চাওয়া।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেনঃ এস্তেগফারের ভিতরে উপরে উল্লেখিত তিনটি বস্তু পাওয়া যাওয়া শর্ত নয়। বরং এস্তেগফার সব মানুষ, সর্বাবস্থায়ই করতে পারে। যখন-ই কোন অন্যায় হয়ে যাবে অথবা অন্তরে গোনাহের কু-মন্ত্রণা জাগবে বা ইবাদতে অলসতা লাগবে সাথে সাথেই পড়ে নিবে–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অবৈধ পন্থায় রিযিক উপার্জনকারীর সমাধান

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন– মুমিনের আসল পথ তো এটাই যে, তার থেকে কোন গোনাহ হয়ে গেলে তাওবা করে নিবে। পাক-সাফ হয়ে যাবে। আর বাস্তবেও দেখা যায় যে, মানুষ তাওবা করার পর অনেক গোনাহকে পরিহার করে। যে সকল গোনাহে লিপ্ত আছে সেগুলোকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু কিছু গোনাহ এমন রয়েছে যে, শত চেষ্টা করলেও সেগুলো পরিহার করা মানুষের পক্ষে সহজ হয়ে উঠে না। অবস্থা এবং পরিবেশের কারণে সে অপারগ হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হল যে, এমন ব্যক্তি কি তাওবা করা থেকে বিরত থাকবে? সে-কি ভাববে যে, আমার তো গোনাহ পরিহার করার ক্ষমতা নেই। আমার জন্য ধ্বংসই অনিবার্য। যেমন, কোন ব্যক্তি সূদী ব্যাংকে চাকুরী করে, সূদী ব্যাংকে চাকুরী করা হারাম এবং নাজায়েয। কারণ সেখানে সূদের লেন-দেন হয়। এখন যে ব্যক্তি দ্বীনের দিকে ঝুকেছে, ক্রমান্বয়ে গোনাহ পরিহার করতে আরম্ভ করেছে, নামায-রোযা সহ শরীঅতের অন্যান্য বিধানসমূহের উপর আমল করতে শুরু করেছে। এ ব্যক্তি তো চিন্তা করছে যে, আমি কিভাবে এ অবৈধ উপার্জন থেকে বাঁচবো? আমি কি এ ব্যাংকের চাকুরী ছেড়ে দেব? কিন্তু তার বিবি, বাচ্চা আছে এবং এদের ভরণ-পোষণও তার কাঁধের উপর। এখন যদি সে এ চাকুরী ছেড়ে দেয়; তবে তাকে দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তার গ্লানি উঠাতে হবে। যার ফলে সে এখন ব্যাংকের চাকুরী ছাড়তে অপারগ। অবশ্য সে আবার হালাল চাকুরী অন্বেষণেও লিপ্ত। (বরং আমি তো বলি যে, সে হালাল চাকুরী এমনভাবে তালাশ করবে, যেমন– চাকুরীহীন ব্যক্তি পাগলপারা হয়ে চাকুরী অনুসন্ধান করে) এখন প্রশ্ন হল যে, এমন ব্যক্তি কি

নিরাশ হয়ে তাওবা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ সে তো চাকুরী ছাড়তে অপারগ। যার ফলে সে চাকুরী ছাড়ার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও করতে পারছে না। অথচ তাওবা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য একটি শর্ত এও যে, ভবিষ্যতে গোনাহ না করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। অথচ সে তা পারছে না। তবে কি এমন ব্যক্তির জন্য তাওবার কোন পথ নেই?

ইমাম গাযালী (রহঃ) উত্তর দিচ্ছেন, এমন ব্যক্তির জন্যও আল্লাহ তা'আলা পথ খোলা রেখেছেন। আর তাহল যে, সে তীব্র প্রচেষ্টা চালানোর পরেও যতক্ষণ পর্যন্ত হালাল পন্থার কোন চাকুরী না পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এ চাকুরী ছাড়বে না। কিন্তু সাথে সাথে তাকে এস্তেগফার করতে হবে। এ অবস্থায় সে তাওবা করবে না। কারণ তাওবা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য গোনাহ পরিহার করা শর্ত। কিন্তু সে এ অবৈধ চাকুরী আপাততঃ ছাড়তে অপারগ। তাই তার তাওবা পরিপূর্ণ হবে না। সুতরাং সে এস্তেগফার করবে এবং বলবে– হে আল্লাহ! আমার এ কাজটি অবৈধ এবং গোনাহের। আমি এ কারণে লজ্জিতও হচ্ছি। কিন্তু কি করবো প্রভূ! আমি তো অপারগ। আমি এই চাকুরী ছাড়তে পারছিনা। আপনি আপনার মেহেরবাণী দ্বারা আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমাকে এ গোনাহ থেকে মুক্তি দান করুন। ইমাম গাযালী (রহঃ) জোর দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি এভাবে দু'আ করে কাজ করে যাবে, ভবিষ্যতে একদিন না একদিন সে গোনাহ ছাড়তে সক্ষম হবে। আর তিনি তার কথার উপর একখানা হাদীস দ্বারা দলীল দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مـاصـر مـن اسـتـغـفـر

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এস্তেগফার করে, সে পুনরায় ঐ গোনাহকারীদের মধ্যে শামীল নয়। (তিরমিযী শরীফ)

আর এ কথাটিকে কুরআনে কারীমে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَافَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহর নেক বান্দা তারাই, যাদের পক্ষ থেকে যদি কোন গোনাহ হয়ে যায় অথবা যদি তারা গোনাহের কারণে নিজেদের উপর জুলুম করে থাকে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং স্বীয় গোনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ব্যতীত গোনাহ মাফকারী কে আছে? এবং তারা যে সমস্ত গোনাহ করেছে তার উপরে তারা হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তা করতে থাকে না।

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত–১৩৫)

সুতরাং সর্বদা এস্তেগফার করতে থাকবে। যদি কোন গোনাহ পরিহার করতে সক্ষম না-ও হও– তবু এস্তেগফার করতে থাকবে, এস্তেগফার ছাড়বে না।

কোন কোন বুযুর্গ তো একথা বলেছেন যে, যে স্থানে গোনাহ করেছো সে স্থানেই এস্তেগফার করে নাও। যেন যে সময় সে জমীন তোমার গোনাহর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে, তখন যেন তোমার তাওবার ব্যাপারেও সাক্ষ্য দেয় যে, এ বান্দা আমার সামনে এস্তেগফারও করে নিয়েছে।

এস্তেগফারের উত্তম বাক্যসমূহ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের প্রতি খুবই মেহেরবাণ ছিলেন। তিনি এস্তেগফারের জন্য এমন এমন বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যে পর্যন্ত মানুষ তার জ্ঞানের ঘোঁড়া হাকিয়ে পৌছতে সক্ষম হবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী (অর্থাৎ দৌড়াতেন) তখন সবুজ দাগের ভিতরে আসলে এ দু'আ পড়তেন–

"رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَنَّا وَتُكْرِمُ وَتُجَاوِزُ عَمَّا تَعْلَمُ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ مَالَانَعْلَمُ - اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ"

অর্থাৎ, হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার উপর রহম কর এবং আমার সব গোনাহ যা তুমি জান ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি আমার এমন গোনাহ সম্পর্কে জানে, যা আমি নিজেও জানিনা। নিশ্চয় তুমি সবচেয়ে বেশী সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন।

দেখুন! কিছু গোনাহ এমনও রয়েছে, যা বাস্তবিক পক্ষেই গোনাহ। কিন্তু সেগুলো যে গোনাহ তা আমরা অনুভবও করতে পারিনা। আর মানুষের পক্ষে সবগোনাহকে পুঙ্খানু-পুঙ্খানুভাবে জানাও সম্ভব নয়। তাই দু'আর মধ্যে শিখিয়ে দিয়েছেন যে, হে প্রভু! আপনার জানা মতে আমার যত গোনাহ আছে সব মাফ করে দিন।

সর্বোত্তম এস্তেগফার

মানুষ যেহেতু গোনাহগার। তাই এস্তেগফার মানুষের করতেই হবে। সুতরাং সর্বোত্তম এস্তেগফারটিই শিখে নেয়া উচিত এবং সেটি নিজের আমলে পরিণত করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। হাদীস শরীফে সর্বোত্তম এস্তেগফার এই এসেছে–

"اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ - وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ - فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ"

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি যতটুকু সম্ভব, আপনার সাথে কৃত ওয়াদার উপর অটল থাকতে চেষ্টা করি। আমি যা অন্যায় করেছি তার অনিষ্ঠ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করি। আপনি আমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তা নিয়ে আপনার দিকে ধাবিত হচ্ছি এবং স্বীয় গোনাহসমূহকে নিয়ে আপনার রহমতের দরবারের দিকেই ধাবিত হচ্ছি। সুতরাং প্রভু! আমার গোনাহ মাফ করে দিন। আপনি ব্যতীত গোনাহ মাফকারী অন্য কেউ নেই। (বুখারী শরীফ)

হাদীস শরীফে এসেছে, কেউ যদি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সকাল বেলা এ দু'আ পাঠ করে, যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত তার মৃত্যু এসে যায়, তবে সে ব্যক্তি সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথবা যদি কোন ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা পড়ে নেয়, আর সকাল পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়, তবে সে ব্যক্তি সোজা জান্নাতে

প্রবেশ করবে। সুতরাং সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আকে নিজের আমলে পরিণত করে নিন। বরং প্রত্যেক নামাযের পরেই একবার করে এ দু'আ পড়ে নিবেন। উল্লেখিত ফযীলতের দিকে লক্ষ্য করে-ই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে 'সাইয়্যেদুল এস্তেগফার' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ, এটা সমস্ত এস্তেগফারের সর্দার বা সর্বোত্তম এস্তেগফার।

মহান রাব্বুল আলামীন যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্বীয় উম্মতদেরকে এ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন; তবে এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা উম্মতদের ক্ষমা করতে-ই চেয়েছেন। তাই আবার বলিঃ একে নিজের আমলে পরিণত করে নিন। যদি এস্তেগফারকে সংক্ষিপ্তভাবে মুখস্ত করে নিতে চান, তবে এভাবে করে নিবে–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

আর যদিও এটাও সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে استغفر الله-ই পড়ে নিবেন।

মানুষের ভিতরে গোনাহের আগ্রহ দেয়া হয়েছে

عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده - لو لا تذنبوا لذهب الله بكم - ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله تعالى - فيغفرلهم

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ঐ সত্ত্বা যার কুদরতী হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি, যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে গোনাহকে ছেড়ে দাও, কোন গোনাহ-ই না কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অস্তিত্বকে এ দুনিয়া থেকে খতম করে দিয়ে এমন এক জাতীকে সৃষ্টি করবেন, যারা গোনাহও করবে, অতঃপর আল্লাহর দরবারে তাওবাও করবে। আর মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমাও করে দিবেন।' (মুসলিম শরীফ)

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি মানুষকে সৃষ্টি করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার এ উদ্দেশ্য হতো যে, আমি এমন এক জাতী সৃষ্টি করবো যাদের ভিতরে গোনাহের কোন চাহিদা থাকবে না। তবে মানুষ সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ এর জন্য তো ফেরেশতারাই যথেষ্ট ছিল। ফেরেশতা তো এমন জাতী যারা সদা-সর্বদা আল্লাহর ইবাদত ও উপাসনায় লিপ্ত। যাদের মধ্যে গোনাহ করার কোন যোগ্যতাই নেই। যদি তারা গোনাহ করতেও চায় তবু তা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না।

পক্ষান্তরে মানব এমন এক জাতী যাদের ভিতরে আল্লাহ তা'আলা ভাল-মন্দ, সৎ ও অসৎ উভয় কাজের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এর উদ্দেশ্য হল যে, মানুষের ভিতরে গোনাহের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর ভয়ে গোনাহ ত্যাগ করবে। আর যদি কখনও কোন গোনাহ হয়ে-ই যায়, তবে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিবে। সুতরাং যদি মানুষের ভিতরে উল্লেখিত অবস্থা পরিলক্ষিত না হয়, তবে তো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য-ই বৃথা হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করার এরাদা করে ফেরেশতাদের মতামত জানতে চাইলেন। তখন তাঁরা তাদের রায় পেশ করলেন যে, হে প্রভু! আপনি দুনিয়ার মাঝে এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করার এরাদা করেছেন, যারা দুনিয়ার মাঝে মারামারি, হানাহানি করবে, অরাজকতা সৃষ্টি করবে। আপনার পবিত্রতা আর গুণ-গান গাওয়ার জন্য তো আমরাই আছি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তরে বললেনঃ

إِنِّى أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ

অর্থঃ আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। (সূরা বাকারা)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তাদের এ মতকে পছন্দ না করে, তাদের দাবীর খেলাফ বলে উঠলেন, হে ফেরেশতা! তোমরা জান না। আমি জানি তারা দুনিয়ায় গিয়ে গোনাহ করবে ঠিকই, তবে তারা আবার আমার নিকট স্বীয় গোনাহের জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিবে। আর আমি তাদের ক্ষমাও করে দেব।

আর মনে রেখো এ জাতি যখন গোনাহের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, তখন তাদের মর্যাদা তোমাদের চেয়ে বেড়ে যাবে। কারণ তোমরা যে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাক, এতে তোমাদের কোন কৃতিত্ব নেই। যেহেতু তোমাদের মধ্যে গোনাহ করার কোন যোগ্যতা-ই নেই। যেমন, এক ব্যক্তি অন্ধ, কিছুই দেখতে পায় না। এখন সে যদি বেগানা মহিলা, টিভি, সিনেমা, অশ্লীল ছবি ইত্যাদি না দেখে, তবে কি এতে তার কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পাবে? অবশ্যই নয়। কারণ তার তো দেখার ক্ষমতা-ই নেই। সে দেখবে কেমন করে।

পক্ষান্তরে সুস্থ চোখের অধিকারী একজন মানুষ। যে সব কিছু দেখতে সক্ষম এবং তার মনে দেখার খুব চাহিদাও জাগে, তবে সে ব্যক্তি তার সমস্ত চাহিদা ও স্বাধকে স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরবান করে, নিজের চক্ষুকে অবৈধ স্থানে ব্যবহার করা থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে সে এমন ব্যক্তিদের কাতারে শামিল, যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

জান্নাতের স্বাধ শুধু মানুষ-ই উপভোগ করবে

ফেরেশতাগণ যদিও জান্নাতে বসবাস করছেন, কিন্তু জান্নাতের স্বাধ, আরাম-আয়েশ তাদের জন্য নয়। কারণ জান্নাতের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ অনুধাবন করার শক্তি তাদের নেই। আর জান্নাতের সুখ-শান্তি আল্লাহ তা'আলা ঐ জাতির জন্য-ই রেখেছেন, যাদের ভিতরে সৎ কাজ ও গোনাহ উভয়টি করার যোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার হেকমত ও কুদরত কি কেউ বুঝতে সক্ষম? তিনি স্বীয় কুদরত দ্বারা এ পৃথিবীকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, এতে তিনি এমন এক জাতিকে আনবেন, যাদের ভিতরে গোনাহ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। আর যদি কখনও মানবিক দুর্বলতার কারণে, ভুলে কোন গোনাহ করেও ফেলে, তাহলে সাথে সাথে তাওবাও করে নিবে। আর এ এস্তেগফারের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার 'গাফ্ফার' (পরম-ক্ষমাশীল)

'সাত্তার' (গোনাহ ঢেকে দেয়ার অধিকারী) গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এখন যদি গোনাহই না হয়, তবে এসব গুণাগুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে কিভাবে?

কুফরীও এ ধরনের হেকমত থেকে খালী নয়

বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, আল্লাহ পাকের এ পৃথিবীতে কোন বস্তু-ই হেকমত শূন্য নয়। এমনকি দুনিয়ার বুকে যে কাফের সম্প্রদায় রয়েছে এবং তাদের থেকে যে খোদাদ্রোহীতা প্রকাশ পাচ্ছে তাও আল্লাহ তা'আলার হেকমত থেকে খালী নয়। মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেনঃ

در کار خانه عشق از کفرنا گزیر است
اتش کرابسوزدگر بولهب نباشد

অর্থাৎ, দুনিয়াতে কুফরী থাকার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ যদি আবু লাহাব (অর্থাৎ কাফের) না থাকতো তবে আগুন কাকে জ্বালাতো?

সুতরাং গোনাহও আল্লাহর ইচ্ছা-ই হয়। আর বান্দার ভিতরে গোনাহের এ খাহেশ এজন্য-ই সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যেন, বান্দা তার এ খাহেশকে খোদাভীতির আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেয়। কারণ বান্দা এ খাহেশকে যত বেশী জ্বালাবে, ততই তার তাকওয়ার পরিপূর্ণতা লাভ হবে। অন্তরে তাকওয়ার নূর সৃষ্টি হবে। তাই তো দুনিয়ার এ খাহেশ এবং কু-প্রবৃত্তিকে ইন্ধনের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেনঃ

شهوت دنیا مثال گلخن است
که از و حمام تقوی روشن است

অর্থাৎ, এ দুনিয়ার কু-প্রবৃত্তি, স্বাধ গোনাহ এদিক দিয়ে অনেক কাজের জিনিস। আল্লাহ তা'আলা এ বস্তুগুলো তোমাকে ইন্ধন হিসেবে দান করেছেন, যেন তুমি এগুলো দ্বারা তাকওয়ার আগুন জ্বালাতে পার। কারণ তাকওয়ার আগুন এগুলোর দ্বারা-ই প্রজ্জ্বলিত হয়। সুতরাং যখন অন্তরে গোনাহের স্বাধ জাগবে, মন গোনাহের প্রতি আকর্ষিত হবে, গোনাহের জন্য মন পাগলপারা হয়ে যাবে, তখন এ সমস্ত খাহেশকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে পরিহার করবে, গোনাহের স্বাধকে জ্বালিয়ে দিবে আর তখন-ই তাকওয়ার পথ আলোকিত হবে। তাকওয়ার নূর অর্জিত হবে।

এখন যদি গোনাহের চাহিদা-ই না থাকতো তবে তাকওয়ার এ জগতকে আলোকিত করতো কি দিয়ে?

ঈমানের স্বাধ

হাদীস শরীফে এসেছে যে, এক ব্যক্তির অন্তরে বেগানা মহিলার প্রতি তাকানোর প্রবল ইচ্ছা হল। কিন্তু সে ইচ্ছা ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এ ভেবে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া থেকে বিরত রইল যে, আমার প্রভু আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তিকে ঈমানের এমন স্বাধ আস্বাদন করার তাওফীক দিবেন যা সে ঐ মহিলার দিকে দৃষ্টি দিলে পেত না।

দেখুন, গোনাহের আকর্ষণ ও ইচ্ছা ঈমানের স্বাধ আস্বাদন করার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। যদি গোনাহের স্বাধ-ই না জাগতো, তবে ঈমানের স্বাধও পাওয়া যেত না। তাই গোনাহের খাহেশ দেখে ভয় পেতে নেই।

গোনাহ সৃষ্টি করার কারণ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ পৃথিবীতে খুব আদর করে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের জীবনের আসল মাকসাদ হল, স্বীয় প্রভুর সাথে গভীর সম্পর্ক কায়েম করা। আর একথাও স্পষ্ট যে, গোনাহের দ্বারা আল্লাহর অবাধ্যতা প্রকাশ পায় এবং আল্লাহ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এখন প্রশ্ন হল যে, তবে আল্লাহ তা'আলা গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি করলেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হল– আল্লাহ তা'আলার গোনাহের উপকরণ সৃষ্টি করার মধ্যে বিরাট হেকমত রয়েছে। তাহল এই যে, বান্দার গোনাহের খাহেশ থাকা সত্ত্বেও যখন সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, তখন সে তাকওয়ার উজ্জল আলো পাবে। আর দ্বিতীয় হেকমত হল, এর মাধ্যমে আসল মাকসাদ (আল্লাহর নৈকট্য) অর্জন হবে। কারণ মানুষ যত বেশী গোনাহ থেকে দূরে থাকবে, তত বেশী তার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে এবং তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য নিত্য-নতুন, সহজ-সরল পথ সুগম করে দিবেন। (সূরা তালাক, আয়াতঃ ৩)

কিন্তু বেঁচে থাকার শত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন গোনাহ সংঘটিত হয়ে যায় এবং তার জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত হয়ে সাথে সাথে সে গোনাহ পরিহার করবে এবং ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় সংকল্প করে তাওবা করবে এবং বলবেঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার পক্ষ হতে ভুল হয়ে গেছে, আমি সকল গোনাহ থেকে তাওবা করছি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

তাহলে এই লজ্জিত হওয়া ও তাওবার দরুণ তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহ তা'আলার গাফফার (পরম ক্ষমাশীল) ও সাত্তার (গোনাহের উপর পর্দা দানকারী) গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

একথাগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভুল না বুঝে সঠিকভাবে বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মনে রাখবেন, গোনাহ করতে গিয়ে কখনও দুঃসাহসিকতা দেখাবেন না– হ্যাঁ, যদি গোনাহ হয়ে যায়, তবে আবার নিরাশও হবেন না। আল্লাহ তা'আলা তাওবা-এস্তেগ্‌ফারের পথ এজন্যই রেখেছেন যেন মানুষ নিরাশ না হয়।

তাই যদি কখনও গোনাহ হয়ে যায়। এরপর অন্তরে অনুশোচনা ও লজ্জার আগুন প্রজ্জলিত হয় এবং এ লজ্জার প্রেক্ষিতে মানুষ আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হয়, তাওবা করে তবে এ কান্না ও অনুশোচনার দরুণ আল্লাহ তা'আলা এত উচ্চ মর্যাদা দান করেন যে, যদি সে গোনাহ না করত, তবে ঐ মর্যাদাপূর্ণ স্থান পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হতো না।

হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)-এর ঘটনা

হাকীমুল উম্মত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তার এক গ্রন্থে হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ঘটনাটি হল যে, হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ) প্রতি রাতেই তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য উঠতেন। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি জাগ্রত হতে পারেননি। তাহাজ্জুদের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সে রাতে তিনি আর তাহাজ্জুদ পড়তে পারলেন না। যেহেতু এর পূর্বে কখনও তার তাহাজ্জুদ নামায বাদ যায়নি। তাই তিনি এতে এতই অস্থির হয়ে পড়লেন যে, সারাদিন কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে কাটালেন। কেঁদে কেঁদে শুধু বললেন– হে আল্লাহ! এটা কি হলো আজ আমার তাহাজ্জুদের নামায ছুটে গেলে।

ঐ দিন রাতে যখন তিনি ঘুমালেন, তখন দেখলেন যে, বহুত বড় একজন বুযুর্গ এসে তাকে ঘুম থেকে জাগাচ্ছেন। হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইলেন? এবং বললেন, এত রাতে এখানে আসলে কেমন করে? উত্তরে সে বলল, আমি হলাম, জামানার কুখ্যাত ইবলিস শয়তান। তখন হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) বললেন, তোমার কাজ তো মানুষকে উদাসীনতার কম্বলে জড়িয়ে ঘুমিয়ে রাখা, কিন্তু তা না করে তুমি আমাকে নামাযের জন্য ডাকছো কেন? আসল ব্যাপারটা কি? খুলে বল?

তখন শয়তান বলল, না এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে যেওনা। যাও! আগে তাহাজ্জুদ পড়ে নাও, নিজের কাজ কর। হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ) বললেন, না! তোমাকে আগে কারণটি বলতেই হবে কেন আমাকে জাগালে? যতক্ষণ তুমি না বলবে, আমি তোমাকে ছাড়ছি না। এভাবে দীর্ঘক্ষণ তাগিদ দেয়ার পর শয়তান আসল ঘটনা প্রকাশ করতে রাজী হলো। সে বলল, গত রাতে আমি আপনার উপর ঘুমের চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, যার ফলে আপনি তাহাজ্জুদ পড়তে পারেননি। কিন্তু সে তাহাজ্জুদ তরক হওয়ার কারণে আপনি সারাটা দিন কাঁদলেন, এর ফলে আল্লাহর নিকট আপনার এত মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে যা আপনি তাহাজ্জুদ পড়ার মাধ্যমেও অর্জন করতে সক্ষম হতেন না। এতে আমার চরম ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই আমি মনস্থ করছি যে, আজ আপনাকে আমি নিজেই জাগিয়ে দিবো। যেন আমি গত দিনের মত ক্ষতিগ্রস্ত না হই।

ফায়দাঃ তাইতো বুযুর্গানে দ্বীন বলে থাকেন, মানুষ যদি সত্যিকারে অন্তর থেকে তাওবা করে, তবে কখনও কখনও এর দ্বারা আল্লাহ তাকে এত মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেন, যা সে কল্পনাও করেনি। আর যা সে কোন ইবাদতের মাধ্যমেও অর্জন করতে সক্ষম হতো না।

এজন্য পূর্বে উল্লেখিত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যদি মানুষ সমস্ত গোনাহকে পরিত্যাগ করে দেয়। তবে আল্লাহ তা'আলা এদেরকে হটিয়ে এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করবেন, যারা গোনাহ করবে এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমাও চাইবে। আর আল্লাহ তাদের সব পাপ মোচন করে দিবেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ হাদীস থেকে একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, দেখ! যদি কখনও ভুল-ভ্রান্তিতে অন্যায়-অপরাধ হয়েও যায়। তবে নিরাশ হওয়ার কোন যুক্তি নেই। বরং তাওবা ও এস্তেগফার কর, তিনি ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু দেখ, নিজের পক্ষ থেকে বেড়ে গিয়ে গোনাহ করতে যেও না। বরং গোনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ যদি চেষ্টা সত্ত্বেও গোনাহ হয়ে-ই যায়, তবে ক্ষমা চেয়ে নিবে।

গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ফরজে আইন

উপরের আলোচনা থেকে মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, গোনাহের ব্যাপারটা যেহেতু খুবই সহজ অর্থাৎ যে কোন সময় ক্ষমা চেয়ে নিলেই ক্ষমা পাওয়া যায়। তবে আর গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার কি প্রয়োজন?

তাই ভাল করে বুঝে নিন যে, সব ধরনের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক। তবে যদি মানবিক দূর্বলতার কারণে কখনও গোনাহ হয়েই যায়, সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে অথবা যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকে যা সে তাৎক্ষণিকভাবে ছাড়তে অপারগ। যেমন কেউ সুদী ব্যাংকের চাকুরীতে আছে তবে এমতাবস্থায় সে হালাল পন্থার চাকুরী এমনভাবে অন্বেষণ করবে যেমন

চাকুরীহীন ব্যক্তি পাগলের মত চাকুরী অনুসন্ধান করে। কিন্তু সে এ অবস্থায় এস্তেগফার করতে থাকবে। অথবা এর দৃষ্টান্ত হল, ঐ হাদীস যা আপনারা হয়ত শুনেছেন যে, যখন কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন এ অসুস্থতার কারণে তার গোনাহ মাফ হতে থাকে এবং আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি রোগের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পায়, তার মর্তবাও ততই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ হাদীসের অর্থ এ নয় যে, মানুষ আল্লাহর নিকট অসুস্থ হওয়ার জন্যে দু'আ করবে? অথবা অসুস্থ হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে? এমনটি অবশ্যই নয়। বরং সবাই জানে যে, রোগ আল্লাহর নিকট চাওয়ার মত বস্তু নয় এবং এর জন্য চেষ্টা ও আকাঙ্খা করা ঠিক নয়। বরং হাদীসে এসেছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সুস্থ থাকার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর। কখনও তাঁর নিকট রোগ চেওনা। হ্যাঁ যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়, তবে মনে রেখো, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে এবং এর দ্বারা গোনাহ মাফ হবে এবং তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এমনিভাবে 'গোনাহ' লিপ্ত হওয়ার মত বস্তু নয়। বরং গোনাহ পরিহার করার মত বস্তু। হ্যাঁ যদি কখনও কোন অবস্থায় গোনাহ হয়ে যায়, তবে ক্ষমা চেয়ে নিবে। আর এ ভাবেই মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। আর এটাই হচ্ছে এস্তেগফারের মূলতত্ত্ব।

তাওবার প্রকারভেদ

তাওবা তিন ভাগে বিভক্ত। (এক) গোনাহ থেকে তাওবা ও এস্তেগফার করা। (দুই) ইবাদত-বন্দেগীতে যে অলসতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে যায়, সেগুলো থেকে তাওবা করা। (তিন) এস্তেগফারের থেকে এস্তেগফার করা অর্থাৎ, এস্তেগফার করার জন্য যে শর্ত ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতার প্রয়োজন ছিল তা তো আমার পক্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে আদায় হচ্ছে না। তাই এর জন্য এস্তেগফার করা।

প্রথম প্রকারঃ অর্থাৎ গোনাহ থেকে এস্তেগফার করা সমস্ত মুসলমানের জন্য ফরজ। কোন মুসলমানই এ হুকুম থেকে বাইরে নয়। এজন্য আত্মশুদ্ধি এবং তরীকতের প্রথম স্তর-ই হচ্ছে 'পরিপূর্ণ তাওবা'। সামনের সবগুলো

স্তর এর উপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা পরিপূর্ণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন পদোন্নতিও হবে না। তাই যখন কোন ব্যক্তি নিজের সংশোধনের নিয়তে কোন বুযুর্গের দরবারে যায়, তখন সে বুযুর্গ তাকে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ তাওবা করিয়ে নেন। ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) বলেনঃ

هو اول اقدام المريدين

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি কোন শায়খের নিকট যায়। তার প্রথম কাজ-ই হচ্ছে 'পরিপূর্ণ তাওবা'। আর শায়খের হাতে যে বায়আত হয়, তা-ও বাস্তবে তাওবার উপরেই হয়ে থাকে। তাওবার সময় মুরীদ তার পেছনের সমস্ত গোনাহ থেকে ক্ষমা চায় এবং ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করে থাকে।

সংক্ষিপ্ত তাওবা

মাশায়েখগণ বলে থাকেন যে, পরিপূর্ণ তাওবা দুই ভাগে বিভক্ত। (এক) সংক্ষিপ্ত তাওবা, (দুই) পুঙ্খানু-পুঙ্খানুরূপে খুলে খুলে সব কিছু থেকে তাওবা করা। সংক্ষিপ্ত তাওবার নিয়ম হচ্ছে, মানুষ একবার ধ্যানের সাথে বসে নিজের জীবনের সব গোনাহকে স্মরণ করে সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। আর এর উত্তম পন্থা হল যে, প্রথমে তাওবার নিয়তে দু রাকাআত নামায পড়বে। এরপর আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটির সাথে এক একটা গোনাহকে স্মরণ করে এভাবে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! এ পর্যন্ত আমার যে সমস্ত গোনাহ হয়েছে। প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে, তোমার হক সম্পর্কে হোক বা বান্দার হক সম্পর্কে হোক, ছোট হোক বা বড়, আমি এসবগুলো থেকে ক্ষমা চাচ্ছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

বিস্তারিতভাবে তাওবা

উপরে যে সংক্ষিপ্ত তাওবার আলোচনা হলো, এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, এখন গোনাহ থেকে সম্পূর্ণ পাক-সাফ হয়েছ। এখন আর কোন দায়িত্ব

নেই। বরং এরপর তফসীলী অর্থাৎ, পুঙ্খানু-পুঙ্খানুরূপে বিস্তারিতভাবে সব গোনাহ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে।

আর এর পদ্ধতি হল, যে সমস্ত গোনাহের ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়, সেগুলোর ক্ষতিপূরণ দিতে শুরু করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণগুলো আদায় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার তাওবা সম্পূর্ণ হবে না। যেমন, ফরজ নামায কাজা হয়েছিল।তার জন্য শুধু তাওবাই যথেষ্ট নয়। শুধু তাওবা করে বসে গেলেই হবে না। বরং জীবনের শুরুলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যত নামায কাজা হয়েছে এর সমস্ত কাজা আদায় করে নিতে হবে। কারণ এ সমস্ত গোনাহের ক্ষতিপূরণ দেয়া মানুষের ক্ষমতার ভিতরে। আর সংশোধনের প্রথম স্তর-ই হচ্ছে পরিপূর্ণ তাওবা। এগুলো আদায় না করলে তাওবাও পরিপূর্ণ হবে না। আর সংশোধনের কোন পথই খুলবে না।

বিস্তারিত তাওবার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আসবে 'নামায'। বালেগ হওয়ার পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যত নামায কাজা হয়েছে, সেগুলোর হিসেব লাগবে। (আর ছেলেরা বালেগ হয়, যখন তাদের স্বপ্নদোষ হয়, আর মেয়েরা বালেগা হয়, যখন তাদের হায়েজ বা মাসিক ঋতুস্রাব আসে। হাঁ যদি কারো মধ্যে এ অবস্থা পরিলক্ষিত না হয়, তবে এ অবস্থায় তাদের বয়স ১৫ বৎসর হলেই তাদেরকে বালেগ-বালেগা হিসেবে ধরা হবে। সেদিন থেকেই তাদের উপর নামায, রোজা সহ শরীয়তের অন্যান্য বিধান সমূহ ফরজ হয়ে যায়।) অনেক লোক তো এমনও রয়েছে, যারা দ্বীনী পরিবেশে থাকে। ছোট থেকে-ই মা-বাবা নামাযে অভ্যস্ত করেন। যার ফলে বালেগ হওয়ার পর থেকে নিয়ে তাদের কোন নামায কাজা হয় না। যদি এমন হয় তাহলে তো কোন কথাই নাই। হ্যাঁ যদি বালেগ হওয়ার পর উদাসীনতার কারণে কোন নামায ছুটে যায়, তবে সেগুলোকে আদায় করে নেয়া ফরজ। আর এর পদ্ধতি হল, নিজের পুরো জীবনের হিসাব করবেন যে, আমার জীবনের কতগুলো নামায কাজা হয়েছে। যদি ঠিক মত হিসাব করা সম্ভব হয়, তবে হিসেব করবেন। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে সতর্কতার সাথে অনুমান করবেন। যেন বেশী হয়, কম না হয়। অতঃপর একটি কাগজে লিখে নিবেন যে, আজ এত তারিখ পর্যন্ত আমার জিম্মায়

এতগুলো নামায ফরজ। আর আমি আজ থেকে সেগুলোর কাজা শুরু করলাম। যদি নিজের জীবনের ভিতরে এ সমস্ত নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে একটি ওসীয়তনামা লিখে দিবেন যে, আমার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে যেন এ সমস্ত নামাযের কাফফারা আদায় করে দেয়া হয়। আর এই ওসীয়তনামা লিখার কারণ হলো, আপনি যদি আপনার জীবদ্দশায় এ ওসীয়তনামা না লিখেই মারা যান, তবে আপনার কাজা নামাযসমূহের কাফফারা আদায় করে দেয়া শরীঅতের দৃষ্টিতে আপনার উত্তরাধিকারীদের উপর ওয়াজিব নয়। যদি তারা আদায় করে দেয়, তবে তা হবে তাদের বদান্যতা। পক্ষান্তরে যদি আপনি ওসীয়ত করে যান, তবে আপনার উত্তরাধিকারীদের উপর আপনার রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে কাফফারা আদায় করে দেয়া ওয়াজিব।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে আর তার নিকট ওসীয়ত করার মত কিছু থাকে, তবে তার জন্য দু'টি রাতও ওসীয়ত করা ব্যতীত কাটানো জায়েয নেই।' (তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড ৩৩ পৃষ্ঠা)

সুতরাং যদি কারো জিম্মায় কাযা নামাজ থাকে, তবে হাদীসের দৃষ্টিতে তার জন্য ওসীয়তনামা লিখা জরুরী। এবার আমরা প্রত্যেকে একটু চিন্তা করে দেখি, আমরা ক'জন আমাদের ওসীয়তনামা লিখছি। অথচ ওসীয়ত নামা না লিখাই আলাদা একটি গোনাহ। যতক্ষণ পর্যন্ত ওসীয়ত নামা না লিখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোনাহ চলতেই থাকবে। সুতরাং আজ থেকে চলুন সকলে আমরা যার যার ওসীয়ত নামা লিখে নেই।

উমরী কাজা আদায়

অতঃপর **'উমরী কাজা'**, তথা পুরো জীবনের কাজা নামায আদায় শুরু করবেন। আর এর পদ্ধতি হলো, প্রত্যেক ওয়াক্তিয়া ফরজ নামাযের পর সাথে সাথে এক ওয়াক্ত কাজাও আদায় করে নিবেন। আর যদি সময় থাকে তবে একের অধিকও পড়া যেতে পারে। যত তাড়াতাড়ি এ নামাযগুলো শেষ করা যায়, ততই উত্তম। বরং ওয়াক্তিয়া নামাযের পর যে নফল পড়ার

নিয়ম আছে, সে নফলের পরিবর্তে কাজা আদায় করবেন। ফজর এবং আসরের পর নফল পড়ার নিয়ম নেই, কিন্তু কাজা পড়া জায়েয আছে। কাজা নামায আদায়ে যেহেতু আল্লাহতা'আলা এত সুযোগ করে দিয়েছেন, তাই আমাদের সে সুযোগগুলো কাজে লাগানো উচিত। আর যতগুলো নামায আদায় করা হয় তা কাগজে লিখে রাখবেন যে, এত ওয়াক্ত আদায় হয়েছে আর এত ওয়াক্ত বাকি আছে।

কেউ যদি এ প্রশ্ন করেন যে, কাজা নামায যেহেতু খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই সুন্নাত নামাযের পরিবর্তে যদি কাজা নামায আদায় করা হয়, এতে কি কোন অসুবিধা আছে? উত্তর হল, হ্যাঁ, অসুবিধা আছে। এমনটি করা যাবে না। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহসমূহ পড়তেই হবে। এগুলো ছেড়ে দেয়া জায়েয নেই। তবে নফল ছেড়ে দিয়ে কাজা আদায় করার সুযোগ আছে।

কাজা রোযার হিসাব ও তার ওসীয়ত

এমনিভাবে নামাযের ন্যায় কাজা রোযারও হিসাব লাগাতে হবে। অর্থাৎ, বালেগ হওয়ার পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কোন রোযা ছুটেছে কিনা? যদি না ছুটে থাকে তবে বেশ ভাল কথা। আর যদি ছুটে থাকে তবে তা করে হিসাব নিজের কাছে একটি ওসীয়ত নামা লিখে রাখবেন যে, আমার উপর রোযা ফরজ হওয়ার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এতগুলো রোযা কাজা হয়েছে। আমি আজ থেকে এগুলোর কাজা আরম্ভ করলাম। আমি যদি আমার জীবনে এগুলো আদায় করে যেতে না পারি, তবে যেন আমার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে এর কাফফারা আদায় করে দেয়া হয়। এ ওসীয়ত নামা লিখার পর যতগুলো রোযা আদায় হয় তা, কাগজে লিখে রাখবে এবং কতগুলো বাকী থাকে তাও উল্লেখ করবে, যেন হিসেব করা সহজ হয়।

যাকাতের হিসাব ও তার ওসীয়ত

অতঃপর যাকাতেরও হিসাব লাগাবেন যে, বালেগ হওয়ার পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কত বৎসর নির্ধারিত যাকাত আদায় ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে। প্রত্যেক বৎসরের যাকাত আলাদা আলাদা হিসাব করে যাকাত

আদায় করে নিবেন। আর যদি সঠিকভাবে স্মরণ না থাকে, তবে খুব সতর্কতার সাথে এমনভাবে অনুমান করবেন যাতে কিছু বেশী হয়। কম যেন না হয়। এরপর ওসীয়ত নামায় লিখে রাখবেন এবং যতটুকু আদায় করতে পারলেন, তা-ও উল্লেখ করে রাখবেন। যেন হিসেব স্পষ্ট থাকে।

এমনিভাবে হজ্জ জীবনে একবার ফরয হয়ে থাকে। যদি হজ্জ আদায় না করে থাকেন, তবে খুব দ্রুত এর আদায়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা করবেন।

বান্দার হক

এ পর্যন্ত উপরে যা উল্লেখ করা হল সবই ছিল, আল্লাহর হক সম্পর্কিত। এরপর আসবে বান্দার হক। বান্দার হক্বের ব্যাপারে চিন্তা করবেন যে, কারো কোন জানী বা মালী হক নিজের উপরে আছে কিনা, যা এখনও আদায় করা হয়নি? যদি থেকে থাকে তবে সেটা আদায় করে নিবেন। না পারলে মাফ করিয়ে নিবেন। অথবা কাউকে যদি কষ্ট দিয়ে থাকেন সেটা ক্ষমা করিয়ে নিবেন।

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'আমি যদি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি অথবা কারো কোন হক আমার উপর থেকে থাকে তাহলে আমি এখন সবার সামনে উপস্থিত, সে হকপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেন আমার কাছ থেকে হক আদায় করে নিয়ে যায়। অথবা যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়।'

যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বান্দার হকের ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে পারেন, তবে আমরা কোন স্তরের লোক? আমরা কি ক্ষমা চাইতে পারবো না? সুতরাং জীবনের শুরুলগ্ন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যাদের সাথে-ই সম্পর্ক হয়েছে, লেন-দেন আছে, উঠা-বসা আছে এবং যত বন্ধু-বান্ধব আছে, সবার সাথে মুখে অথবা পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাদের প্রাপ্য হকের কথা জানিয়ে দিন। যদি কারো মালী হক আপনার উপর থেকে থাকে, তবে তাও আদায় করে দিন। আর যদি জানী হক হয়, যেমনঃ কারো গীবত করেছেন, কাউকে গালী দিয়েছেন বা অন্য কোনভাবে কষ্ট দিয়েছেন, তাহলে এগুলো থেকেও ক্ষমা চেয়ে নিবেন।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো উপর জুলুম করে থাকে, সে জুলুম মালের উপর হোক বা জানের উপর। আজ যেন সে জালেম মজলুমের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। অথবা সোনা-রূপা দিয়ে ঐ দিন আসার পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে নেয়, যে দিন সোনা-রূপা থাকবে না বা সোনা-রূপার কোন মূল্যই থাকবে না।

আখেরাত পন্থীদের অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা করার তাওফীক দান করেছেন, তারা প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাদের হকসমূহ আদায় করে দিয়ে থাকেন। অথবা তাদের নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন। হযরত থানভী (রহঃ)-এ সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে العذر والنظر। আল উজরু ওয়ান্নাজরু') নামে একটি রিসালা লিখে নিজের সম্পর্কাধীন ব্যক্তিদের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যার মধ্যে তিনি লিখেছেন, 'যেহেতু আপনাদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে হয়ত কারো সাথে আমার অপব্যবহার হয়েছে অথবা কারো কোন হক আমার উপর রয়েছে, আল্লাহর ওয়াস্তে আজ আপনারা আমার কাছ থেকে আপনাদের হক নিয়ে যাবেন অথবা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।'

এমনিভাবে আমার সম্মানিত পিতা, হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) নিজের সম্পর্কাধীন ব্যক্তিদের নিকট 'کچھ تلافی مافات 'ছুটে যাওয়া কিছু ক্ষতিপূরণ' নামে একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের পূর্বসুরী বুযুর্গরা সুন্নাতকে এভাবেই পালন করতেন। সুতরাং সকলের এর উপরও গুরুত্ব দেয়া উচিত। এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হল সবই বিস্তারিত তাওবার প্রকার।

যদি বান্দার হক থেকে যায়?

এ কথাতো সবারই জানা আছে যে, আল্লাহর হক তাওবা দ্বারা মাফ হতে পারে। কিন্তু বান্দার হক ততক্ষণ পর্যন্ত মাফ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত

সে তার হক, প্রাপ্যকে আদায় করে না দিবে বা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে না নিবে। কিন্তু হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন– যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যার পক্ষ থেকে অপরের হক নষ্ট হয়ে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সে সমস্ত হক আদায় করে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা দান করেন। তাওবার তাওফীক হয়। তাই সে মানুষের নিকট গিয়ে বলে, যাদের যে হক আমার উপর আছে নিয়ে যাও। কিন্তু সে সমস্ত হক আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেগুলোর মালিকের ইন্তেকাল হয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, যে সমস্ত হক সে আদায় করতে পারেনি বা ক্ষমাও চেয়ে নিতে পারেনি। সেগুলোর কারণে যে শাস্তি হওয়ার কথা সে কি তা থেকে বাঁচতে পারবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন– এমন ব্যক্তিরও নৈরাশ হওয়ার কোন হেতু নেই। কারণ সে যেহেতু হক আদায় ও তাওবার পথে চলতে শুরু করেছিলো এবং প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছিল। এই প্রচেষ্টার বরকতে আল্লাহ তা'আলা হক প্রাপ্য ব্যক্তিকে রাজি করিয়ে সে ব্যক্তির হক মাফ করিয়ে ছাড়বেন। আর সে হক প্রাপ্য ব্যক্তি তার হক ছেড়ে দিবে। ইন্‌শাআল্লাহ।

অপ্রত্যাশিত ক্ষমা

উল্লেখিত কথার দলীল হিসেবে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ একটি ঘটনাটি উল্লেখ করেন, এক ব্যক্তি নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর তার অন্তরে তাওবার করার চিন্তা মনে জাগ্রত হলো। তাই সে চিন্তা-ভাবনা করে এক খৃষ্টান পাদ্রীর এর নিকট গেল এবং বলল, হুযূর! আমি এ পর্যন্ত নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছি। এখনকি আমার মুক্তির কোন পথ আছে? সে রাহেব উত্তর দিল, না তোমার মুক্তির কোন উপায় নেই। তোমার ধ্বংস অনিবার্য। এ কথা শুনে সে নৈরাশ হয়ে গেল এবং চিন্তা করল যে, নিরানব্বই জন তো হত্যা করেছি। এক শতের কোঠা পুরো করেই নেই। এ কথা ভেবে সে এ রাহেবকেও হত্যা করে ফেলল। অন্তরে যেহেতু

তাওবার চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই দ্বিতীয়বার আবার কোন আল্লাহর ওলীর সন্ধানে বের হয়ে পড়ল। খুজতে খুঁজতে এক আল্লাহর ওলীর সন্ধান পেয়ে গেল। তার নিকট গিয়ে নিজের সব ঘটনা খুলে বলল। সে আল্লাহর ওলী তার সব কথা শুনে বললেন, আরে! তোমার নৈরাশ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি প্রথমে তাওবা করে নাও। অতঃপর এ গ্রাম ছেড়ে ঐ গ্রামে চলে যাও (যে গ্রামের অধিবাসীরা ছিল ন্যায়পরায়ণ ও সৎ লোক) এবং তাদের সংশ্রব অবলম্বন কর।

যেহেতু সে ইখলাসের সাথে তাওবা করেছিল। তাই সে এ গ্রাম ছেড়ে সেই সৎ লোকদের গ্রামের দিকে ছুটে চলল। কিন্তু রাস্তায়-ই তার মৃত্যু এসে গেল।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন সে মুমূর্ষ অবস্থায়ও হামাগুড়ী দিয়ে সে গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এ অবস্থায় সে ইন্তেকাল করল। এখন তার রূহ নেয়ার জন্য রহমতের ফেরেশতারাও আসলেন এবং শাস্তির আযাবের ফেরেশতারাও আসলেন এবং উভয়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, যেহেতু সে তাওবা করে সৎ লোকদের এলাকার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করেছিল তাই আমরা তার জান নেব। আযাবের ফেরেশতাগণ বললেন এ ব্যক্তি একশত জন লোককে হত্যা করেছে, তার ক্ষমা পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং আমরাই তার জান নেব। উভয়ের মাঝে এভাবে ঝগড়া চলছিল। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা ফাসায়ালা দিয়ে দিলেন যে, 'মেপে দেখা হোক, সে যে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল সেটা বেশী নিকটে, না কি যে গ্রামে ছিল সেটা বেশী নিকটে। মাপার পর দেখা গেল যে, সে যে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল সেটা একটু নিকটে, তাই রহমতের ফেরেশতারা-ই তার জান নিল। আর আল্লাহ তাকে তার প্রচেষ্টার বরকতে ক্ষমা করে দিলেন। (মুসলিম শরীফ, কিতাবুত তাওবাহ)

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, যদিও তার জিম্মায় বান্দার হক ছিল। কিন্তু যেহেতু সে নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এমনিভাবে কোন মানুষের

উপর যদি কারো কোন হক থাকে। আর সে এগুলো আদায় করে দেয়ার প্রচেষ্টা আরম্ভ করে, চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। আর এমতাবস্থায় তার মৃত্যু এসে যায়; তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহতা'আলা স্বীয় রহমত দ্বারা সে হক প্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাজি করিয়ে হকদাতা ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং সকলেই উভয় প্রকার অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত তাওবাহ করে নিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

গোনাহকে ভুলে যাও

আমাদের শায়খ ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ) (যিনি হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন) বলতেন, যখন তুমি সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত উভয় প্রকার তাওবা করে নিলে, তখন পেছনের সব গোনাহকে ভুলে যাও। সেগুলোকে আর স্মরণ করতে যেও না। কারণ যে সমস্ত গোনাহ থেকে তুমি তাওবা করে নিয়েছো, সেগুলোকে পুনরায় স্মরণ করা মানে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাকে অবমূল্যায়ন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, যদি তোমরা আমার নিকট তাওবা, এস্তেগফার কর, তবে তোমাদের তাওবা কবুল করা হবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। শুধু তাই নয় বরং তোমাদের বদ আমলের খাতা থেকে গোনাহকে মিটিয়েও দেয়া হবে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, তাওবার কারণে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ তুমি সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত আছো। এতে আল্লাহ তা'আলার রহমতের অবমূল্যায়ন প্রকাশ পায়। অনেক সময় এটা আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। তাই আর স্মরণ করতে যেওনা।

কেউ কেউ মনে করেন যে, মুনাজাতের সময় নিজের বিগত জীবনের গোনাহকে স্মরণ করে বেশী বেশী কান্নাকাটি করা উত্তম। আসলে এ উক্তিটি সঠিক নয়। এটা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি নয়। অনভিজ্ঞ লোকেরা কখনও কখনও বিপরিত কথা বলে দেয়। আমার এক বন্ধু ছিলেন। যিনি খুব পরহেজগার। সর্বদা রোযা রাখতেন। তাহাজ্জুদ পড়তেন। একজন পীরের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি বলতেন, আমার পীর সাহেব

আমাকে বলেছেন যে, রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠবে তখন নিজের পেছনের জীবনের গোনাহসমূহকে স্মরণ করে করে খুব কাঁদবে। কিন্তু আমাদের শায়খ ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ) বলেন, আসলে এটা সঠিক পন্থা নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাওবার পরে আমাদের পেছনের সব গোনাহকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাদের আমলনামা থেকে তা মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আপনি সেটাকে স্মরণ করে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, সে গোনাহগুলোকে এখনও মিটিয়ে দেয়া হয়নি। আর ভাবছেন যে, আমি এ গোনাহকে মিটতে দেব না। বরং এগুলো শুধু স্মরণ করে যাব। এটা সঠিক পন্থা নয়। কারণ এতে আল্লাহ পাকের রহমতের অবমূল্যায়ন প্রকাশ পায়। বরং সঠিক পন্থা হল, পিছনের যে সমস্ত গোনাহ থেকে আপনি সঠিকভাবে তাওবা করেছেন, সেগুলোকে আর স্মরণ করবেন না। হ্যাঁ, যদি কখনও স্মরণ পঁড়ে সাথে এস্তেগফার পড়ে নিবেন।

বর্তমান অবস্থার সংশোধন চাই

আমাদের শায়খ হযরত মাওলানা ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ) কত সুন্দর কথা বলেছেন। যা স্মরণ রাখার মত। তিনি বলেন, 'যেহেতু তুমি তাওবা করেছ। তাই অতীতের কথা ভুলে যাও। তাওবা করার পর মনে করো যে, মহান আল্লাহতা'আলা তার রহমতে এ দু'আ কবুল করে নিবেনই ইনশাআল্লাহ। আর ভবিষ্যতের আগাম চিন্তাও ছেড়ে দাও যে, হায়! ভবিষ্যতে আমার কি হবে?'

আজ আমাদের অবস্থা হল যে, আমরা অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন হই যে হায়! আমার থেকে এত গোনাহ হয়েছে, এখন আমার অবস্থাটা কি হবে? আমি ক্ষমা পাব কিভাবে? যার ফলে নিরাশ হয়ে নিজের অবস্থা আরো খারাপ করে ফেলে। অথবা ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত হই যে, এখন যদি তাওবা করেও নেই সামনে কি গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবো? আরে এ চিন্তা করেন যে, যখন ভবিষ্যত আসবে, তখন দেখা যাবে। তাই এসব চিন্তা ছেড়ে বর্তমান যে অবস্থায় আছেন, এর চিন্তা করেন। একে সংশোধন করেন, এখনই আল্লাহর ইবাদত করেন, এখন সব ধরনের গোনাহ

থেকে বেঁচে থাকেন। বর্তমান অবস্থা দুরস্ত করে নিন। কারণ এ বর্তমানই অতীতে পরিণত হচ্ছে, আর প্রত্যেক ভবিষ্যতই বর্তমান হচ্ছে। তাই বর্তমান অবস্থা ঠিক করে নিন। অতীতের কথা ভেবে ভেবে নিরাশার রাজ্যে বসবাস করবেন না।

আর এটা বাস্তবে শয়তানের এক ধোঁকা। সে আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে যে, দেখ! অতীতে তুমি কত জঘন্য গোনাহ করেছো। আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখ, তোমার অবস্থাটা কি হবে? এই অতীত ও ভবিষ্যতের চক্করে ফেলে আপনার অবস্থা জটিল করে তুলছে। তাই আপনি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আপনার অবস্থা খারাপ করবেন না। বরং শুধু বর্তমান অবস্থাকে দুরস্ত করে নিন। তবে অতীত ও ভবিষ্যত আপনার হাতের নাগালে এসে যাবে।

উন্মুক্ত দ্বার

عن ابى قلابة رحمه الله قال - ان الله لما لعن ابليس سئله النظرة - فانظره الى يوم الدين - قال وعزتك لااخرج من قلب ابن ادم مادام فيه الروح - قال الله تعالى - وعزتى لااحجب عنه التوبة مادام الروح فى الجسد

সর্বোত্তম স্তর

যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং ঈমান নিয়ে ইন্তিকাল করেছেন, তাকে বলা হয় 'সাহাবী'। আর যে ঈমান অবস্থায় সাহাবাদের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং ঈমানদাররূপে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে বলা হয় 'তাবেয়ী'। আর যে ঈমান অবস্থায় কোন তাবেয়ীর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে বলা হয় 'তাবে তাবেয়ী'। এই তিনটি স্তর এমন যার সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম স্তর বলেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

অর্থাৎ, সবচেয়ে উত্তম লোক হল আমার যামানার লোক। অতঃপর তাঁরা যারা তাদের পরে অতঃপর তারা যারা তাদের পরে। (বুখারী শরীফ)

তাই হযরত সাহাবায়ে কেরামের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাবেয়ীনদেরকে অনেক উচ্চ মাকাম দান করেছেন। হযরত আবু কালাবা (রহঃ) তাবেয়ীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সরাসরি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতে পারেননি। কিন্তু বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাত করেছেন। তিনি হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন।

তাবেয়ীদের সতর্কতা

এ হাদীস যা হযরত আবু কালাবা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন যদি ও তিনি এটাকে নিজের বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে এটা হাদীস। কেননা তিনি এটাকে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলতে পারেন না। তবে তিনি এটাকে নিজের বক্তব্যরূপে এজন্য বলেছেন যে, তাবেয়ীগণ কোন কথা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে সম্পৃক্ত করতে খুব ভয় পেতেন। যেন কোন কথা সম্পৃক্ত করতে গিয়ে ব্যতিক্রম না হয়ে যায়। যার দরুণ পরকালে জওয়াবদিহি করতে হয় যে, তোমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ভুল বর্ণনা করেছ। কারণ হাদীস শরীফে এসেছেঃ

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে অথবা আমার দিকে এমন কথা সম্পৃক্ত করবে যা আমি বলিনি, তবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (বুখারী শরীফ)

কত শক্ত হুশিয়ারী হুযূর দিয়েছেন। তাই সাহাবাগণ ও তাবেয়ীগণ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে ভয়ে কাপতেন।

হাদীস বর্ণনা করতে সাবধানতা

একজন তাবেয়ী একজন সাহাবী সম্পর্কে বলেন যে, সে যখন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তার চেহারা হলুদ হয়ে যেত এবং কখনও কখনও ভয়ে কাঁপতেন। না জানি ভুল কোন কথা বের না হয়ে যায়। এমনকি কোন কোন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করার পর বলতেনঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'এভাবে অথবা 'এরকম' অথবা ' এ ধরনের' কথা বলেছেন আমার পক্ষ হতে কোন ভুল হয়ে যেতে পারে। আর তাঁরা তা এজন্য করতেন যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কোন ভুল কথা সম্পৃক্ত না হয় এবং এর গোনাহর ভাগী না হন।

এর দ্বারা আমাদের শিক্ষা মিলে যে, আমরা অনেক সময় যাচাই-বাছাই করা ব্যতিরেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করি। কোথাও যদি কোন কথা শুনি তবে সাথে সাথে বলে দেই, 'হাদীসে এমন এসেছে'। অথচ দেখুন যে সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শুনেছেন তা সত্ত্বেও কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু আমরা সাবধানতা অবলম্বন করিনা। তাই হাদীস বর্ণনা করতে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক সঠিক বাক্য না জানবো ততক্ষণ বর্ণনা করবো না। এ হাদীসে হযরত আবু কালাবা (রহঃ) এভাবে বলেননি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন্। বরং নিজ মুখের বাণীর মত বলেছেন অথচ এটি বাস্তবে হাদীস।

অর্থঃ হযরত আবু কালাবাহ (রহঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন শয়তানকে অভিশপ্তরূপে বিতাড়িত করলেন, তখন সে আল্লাহর নিকট একটু সুযোগ চাইলো অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত চাইলো। আল্লাহ তা'আলা তাকে সুযোগ দিলেন অর্থাৎ আল্লাহপাক তাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিলেন, তখন সে বলল, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি আদম সন্তানের অন্তর থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত বের হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরের ভিতরে রূহ থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বললেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমি আদম সন্তানদের জন্য তাওবার দ্বার ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরে জান থাকে।

ব্যাখ্যাঃ এ ঘটনা সবারই জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন শয়তানের প্রতি হযরত আদম (আঃ)কে সিজদাহ করার নির্দেশ দিলেন, তখন শয়তান এ আদেশকে অমান্য করল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে বিতাড়িত করলেন।

বাস্তবে যদি চিন্তা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে, শয়তান যে কথা বলেছে তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গত ছিল না। কারণ যুক্তি ছিল যে, এ কপাল তো শুধু আপনারই জন্য। মাটির এই পুতুল যাকে আপনি নিজ হাতে বানিয়েছেন তাকে কেন সিজদাহ করবো?

কিন্তু অন্যায় এটা হয়েছে, যে সত্ত্বার জন্য তার এ কপাল সে সত্ত্বা যেহেতু সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন সে হুকুমের সামনে নিজের জ্ঞানের ঘোঁড়া দৌড়িয়ে এবং তার চিন্তা করা যে, মাটির এই পুতুল সিজদাহর যোগ্য কি যোগ্য নয়? এ দেহ সিজদা পাওয়ার যোগ্য নয়। এ হুকুম মানা সম্ভব নয়।

দেখুন, বাস্তবে কিন্তু মানুষ সিজদার যোগ্য নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত যখন এ দুনিয়ায় আসলো তখন তিনি মানুষকে সিজদা করার প্রথা চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। তাই বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষকে সিজদা করা কোন অবস্থাই জায়েয নয়। কিন্তু সেটা যেহেতু ছিল আল্লাহর হুকুম তাই সেখানে নিজের বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়ানো ঠিক হয়নি। কিন্তু শয়তান তা করেছিলো।

আর শয়তানের দ্বিতীয় অপরাধ ছিল, সে সিজদা না করার কারণ বলতে গিয়ে এটা বলেনি যে, এ কপাল কেবলমাত্র আপনারই জন্য তাই সিজদা করবো না। সে বলেছে, হে আল্লাহ! আপনি আদমকে বানিয়েছেন মাটি দ্বারা। আর আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা। মাটি হতে আগুন উত্তম। তাই আমি আগুন হয়ে মাটিকে সিজদা করি কেমন করে? এতে তার অহংকার প্রকাশ পেল। তাই আল্লাহতা'আলা তাকে বিতাড়িত করে দিলেন।

কিন্তু আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হওয়ার এই মারাত্মক মুহূর্তেও শয়তান আল্লাহর নিকট সুযোগ চেয়েছিল এবং বলেছিলঃ

اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

অর্থাৎ, হে প্রভু! আমাকে সে সময় পর্যন্ত সুযোগ দিন, যে দিন আপনি মানুষদেরকে উঠিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবেন। মূলকথা আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখুন। (সূরা আরাফ– আয়াত নং ১৬)

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, এ ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, শয়তান আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে খুব ভাল করে জানতো। কারণ সে একদিকে বিতাড়িত হতে যাচ্ছে। বেহেশ্ত থেকে বের হচ্ছে। তার উপর আল্লাহর গযব নাযিল হচ্ছে। কিন্তু এ কঠিন মুহূর্তেও সে আল্লাহর নিকট দু'আ করছে, সুযোগ অনুসন্ধান করছে। কারণ সে জানতো যে, আল্লাহ তা'আলার উপর তার ক্রোধ প্রবল হতে পারে না। চরম রাগের মুহূর্তেও যদি তার নিকট কিছু চাওয়া হয়, তবুও তিনি তা দান করে থাকেন। শয়তান সে কথা বুঝেই সুযোগ সন্ধান করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তার জবাব দিতে গিয়ে বললেনঃ

اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (سورة الحجر : ٣٨)

অর্থাৎ, আমি তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিচ্ছি, কিয়ামত পর্যন্ত তোমার মৃত্যু আসবে না। যখন তার দরখাস্ত কবুল হয়ে গেল এবং সে সুযোগ পেয়ে গেল, তখন সে বলে উঠল, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, আমি আদম সন্তানের অন্তর থেকে সে সময় পর্যন্ত বের হবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহে রূহ অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের থেকে আলাদা হবো না। এ আদম সন্তান! যাদের কারণে আমাকে জান্নাত থেকে বের হতে হয়েছে, তাদের অন্তরে আমি কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে থাকবো। তাদেরকে ধোঁকা দেব। তাদেরকে গোনাহের সরঞ্জামাদি জোগাড় করে দেব। তাদেরকে গোনাহের দিকে ধাবিত করবো। যতক্ষণ তারা জীবিত থাকবে।

শয়তানের একথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইজ্জতের কসম খেয়ে বললেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমি সে পর্যন্ত আদম সন্তানদের জন্য তাওবার দ্বার বন্ধ করবো না, যে পর্যন্ত তাদের দেহে রূহ থাকে, তুমি যেহেতু আমার ইজ্জতের শপথ করে বলেছ যে তুমি বের হবে না। তাই আমিও আমার ইজ্জতের শপথ করে বলছি যে, আমিও তাওবার পথ বন্ধ করব না। তুমি যদি তাদের অন্তরে গোনাহের বিষ ঢেলে থাক, তবে আমি তাদেরকে এর প্রতিষেধকও দিয়ে রেখেছি। অর্থাৎঃ তাদের জন্য সর্বদা তাওবার দ্বার উম্মুক্ত রেখেছি। যখনই মানুষ তাওবা করবে, সাথে সাথে আমি তোমার সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দেব। যেন আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি 'রহমতের' ঘোষণা দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, দেখ! তোমরা একথা মনে করো না যে আমি তোমাদের উপর এমন কাউকে প্রবল করে দিয়েছি, যার আক্রমন থেকে তোমরা বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে না। বাস্তবে আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমি শয়তানকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের একটু পরীক্ষার জন্য। আমিই একে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার যোগ্যতা দান করেছি। কিন্তু এত ক্ষমতা দেইনি যে, তোমরা তাকে হারাতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا

অর্থাৎ, শয়তানের ধোঁকা খুবই দুর্বল। এতই দুর্বল যে, যদি কোন ব্যক্তি শয়তানের সামনে মাথা উঁচিয়ে বলে যে, আমি তোমার কথা শুনবো না এবং তুমি যে গোনাহের দিকে ডাকছো আমি তোমার ডাকে সাড়া দেব না। তাহলেই শয়তান হেরে যায়। শয়তান হিংস্র হায়েনার ন্যায় ঐ সমস্ত লোকের উপর থাবা মারে, যারা হিম্মতের সাথে কাজ করতে চায় না। গোনাহ পরিহার করার ইচ্ছাও করে না। কিন্তু যদি মানুষ সিংহের মত গর্জন করে দাঁড়ায়। তখন পরাজয় শয়তানেরই ঘটে থাকে। যদি কোন হিম্মতহারা লোক শয়তানের ধোঁকায় পড়েও যায়, তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ আল্লাহপাক বলেন, আমি তো 'তাওবা' নামক প্রতিষেধক সৃষ্টি করেই দিয়েছি। আমার নিকট আস, স্বীয় গোনাহকে স্বীকার করে বল, হে

আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে ভুল হয়ে গেছে এবং এস্তেগফার করতে থাক দেখবে, এক মুহূর্তে শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে।

গোনাহগারদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كلكم خطائون وخير الخطائين التوابون

অর্থাৎঃ তোমাদের প্রত্যেকেই অনেক বড় গোনাহগার। (আরবী ভাষায় خطاء ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে অনেক গোনাহ করে থাকে। আর যে ব্যক্তি সাধারণ গোনাহগার তাকে বলা হয় خاطى যার অর্থ হচ্ছে গোনাহকারী। আর خطاء এর অর্থ হচ্ছে অনেক গোনাহকারী) কিন্তু সেই গোনাহগারদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তাওবা করে নেয়। (তিরমিযী শরীফ)

উক্ত হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার ভিতরে তোমাদের পক্ষ থেকে গোনাহ হবেই। গোনাহের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু সেগুলো থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা করতে হবে। তবে যদি কখনও গোনাহ হয়েই যায় তাহলে আমার নিকট তাওবা করে নিবে। নিরাশ হবে না। হাদীসে تائب শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, যার অর্থ হচ্ছে তাওবাকারী বরং تواب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ, 'বার বার তাওবাকারী' অর্থাৎ, শুধু একবার তাওবা করলেই যথেষ্ট নয়। বরং যতবারই গোনাহ হবে প্রত্যেকবারই তাওবা করে নিবে। আর যত বেশী বেশী তাওবা করবে, ততই বেশী শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

একশতের এক

عن ابى هريرة رض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة مأة جزء فامسك عنده تسعة وتسعين – وانزل فى الارض جزء واحدا – فمن ذالك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহতা'আলা একশত 'রহমত' সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে এক ভাগ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। যার প্রেক্ষিতে মানুষ মানুষকে ভালবাসে, একে অপরের উপর দয়া করে থাকে। পিতা তার সন্তানদের উপর রহম করে, মা সন্তানদের আদর করে। ভাই ভাইকে ভালবাসে, ভাই বোনকে ভালবাসে, আদর করে, স্নেহ করে, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে এক বন্ধু অপর বন্ধুকে। এক কথায় এ দুনিয়ায় যত প্রাণী একে অপরকে ভালবাসে সবই সে এক'শ ভাগের এক ভাগ থেকে। এমনকি ঘোড়ার বাচ্চা যখন তার মায়ের নিকট দুধ পান করার জন্য আসে, তখন সে ঘুড়ী নিজের পা উঠিয়ে নেয়। দুধ পান করার সময় যেন পা দ্বারা তার বাচ্চা কোনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। এটাও সেই এক'শ ভাগের এক ভাগ থেকেই। আর বাকি নিরানব্বই ভাগই আল্লাহতা'আলা তার নিকট রেখে দিয়েছেন। এর দ্বারা আল্লাহতা'আলা আখেরাতে নিজের বান্দাদের উপর রহমতের প্রকাশ ঘটাবেন।' (মুসলিম শরীফ)

এই হাদীস দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তোমরা কি সে সত্ত্বার রহমত থেকে নিরাশ হচ্ছ, যিনি তোমাদের জন্য আখেরাতে সমস্ত রহমতকে একত্রিত করে রেখে দিয়েছেন? তিনি কি তোমাদেরকে তার রহমত থেকে বঞ্চিত করে দিবেন? না! কখনও নয়। সুতরাং তোমরা তার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ো না। বরং আল্লাহর রহমতকে তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট করে নাও। আর এর পদ্ধতি হল বেশী বেশী এস্তেগফার কর, গোনাহ পরিহার কর, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। এসব কাজ যত বেশী করবে, তত বেশী আল্লাহর রহমত তোমার প্রতি নিবিষ্ট হবে।

শুধু আকাংখাই যথেষ্ট নয়

আল্লাহতা'আলা একশত ভাগ রহমত প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু সে রহমত ঐ ব্যক্তিরই কাজে আসবে যে চায়, আমি আল্লাহতা'আলার রহমত

থেকে ফায়দা উঠাবো। এখন যদি কোন ব্যক্তি সে রহমত থেকে উপকৃত হতে না চায়, বরং পুরো জীবন অলসতায় কাটিয়ে দেয়, অতঃপর এ আশা করে যে, তিনি 'পরম ক্ষমাশীল'। এ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله

অর্থাৎ, অক্ষম ঐ ব্যক্তি যে কু-প্রবৃত্তির পেছনে দৌড়াতে শুরু করেছে, আর আল্লাহতা'আলার উপর ভরসা করে বসে আছে যে,, 'আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল, ক্ষমা করে দিবেন।

হ্যাঁ যে ব্যক্তি নিজের আমল দ্বারা আল্লাহর রহমতের আশাবাদী এবং খুব প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে, আল্লাহর রহমত তাকে আখেরাতে পরিবেষ্টন করে নিবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

অসাধারণ ক্ষমা

অন্য এক হাদীসে এসেছে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়েছেন। এক ব্যক্তি ছিল খুব বড় গোনাহগার। নিজের উপর খুব জুলুম করেছিল। অসৎ পথে স্বীয় জীবন বিলীন করেছে। অবশেষে যখন মৃতুর মুখে এসে পড়ল। তখন সে নিজের পরিবারস্থ লোকদেরকে ওসীয়ত করতে গিয়ে বলল, আমি আমার এ জীবন অসৎ পথে ব্যয় করেছি। জীবনে কোন সৎ কাজ করিনি। তাই আমি যখন মৃতুবরণ করবো তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে দিও। জ্বালানোর পর যে ছাই হবে তা খুব প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিও যেন দূর-দূরান্তে গিয়ে পড়ে। আর জেনে রেখো আমি এ ওসীয়ত এজন্যই করছি যে, আল্লাহর শপথ! আমি যদি আল্লাহ তা'আলার হাতে ধরা পড়ি, তবে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন য়া দুনিয়ার অন্য কাউকে দিবেন না। কারণ আমি খুব জঘন্য অপরাধ করেছি।

যখন সে ব্যক্তির ইন্তেকাল হল, তার পরিবারস্থ লোকেরা তার ওসীয়তের উপর আমল করতে গিয়ে তার লাশ জ্বালিয়ে দিল। আর সে ছাইগুলোকে খুব করে পিষে প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিল। যার ফলে সবগুলো ছাই দুর-দুরান্তে গিয়ে পড়ল।

এটা তো ছিল তার নির্বুদ্ধিতা। সে ভেবেছিল যে, আল্লাহতা'আলা আমার দেহের এই বিক্ষিপ্ত ছাই একত্র করতে সক্ষম নন। তাই আল্লাহতা'আলা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন যে, বিক্ষিপ্ত ছাই সমূহকে একত্রিত কর। যখন একত্রিত করা হল, তখন বললেন, এগুলোকে পুনরায় পূর্ণ মানুষ বানিয়ে দাও যেমন সে পূর্বে ছিল। আল্লাহর হুকুম মত তাকে পূর্ণ মানুষ বানিয়ে দেয়া হল। এরপর তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হল। আল্লাহতা'আলা তাকে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার তুমি তোমার পরিবারস্থ লোকদেরকে এ কাজের ওসীয়ত কেন করলে? উত্তরে সে বলল, হে প্রভু! শুধু তোমার ভয়ে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, আমি যে সমস্ত অন্যায় করেছি তার প্রেক্ষিতে আপনি আমাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। তাই আমি আপনার শাস্তির ভয়ে এ ধরনের ওসীয়ত করেছিলাম। তখন আল্লাহতা'আলা বললেন, সত্যিই কি তুমি আমার ভয়ে এসব করেছো? যাও তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। (মুসলিম শরীফ)

একটু চিন্তা করে দেখুন! তার ওসীয়তটা ছিল নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয় বরং এটা ছিল তার কুফুরী আকীদা। কারণ, সে বলেছিল যে, আমি যদি আল্লাহর হাতে ধরা পড়ি, তবে তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন। অর্থাৎ, যদি তোমরা আমাকে ছাই বানিয়ে উড়িয়ে দাও, তবে আমি আর তার হাতে ধরা পড়বো না। (নাউযুবিল্লাহ) এ তো কুফরী মতবাদ। সে যেন দাবী করছে যে, আল্লাহতা'আলা বিক্ষিপ্ত ছাইকে একত্রিত করতে সক্ষম নন। কিন্তু যখন আল্লাহতা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন এসব করেছো? উত্তরে সে বলল, হে আল্লাহ শুধু তোমার ভয়েই করেছি। তখন আল্লাহ তাকে বললেন, আচ্ছা যেহেতু তুমি জানতে যে, আমি তোমার প্রভু।

আর তুমি প্রভু হিসেবে আমাকেই মানতে এবং একথাও জানতে যে, তুমি আমার নাফরমানী করেছো এর উপর তুমি লজ্জিতও হয়েছো এবং মৃত্যুর পূর্বে তার প্রকাশও তুমি করেছো। তাই আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা দ্বারা আমাদরকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর রহমত তোমাদের কাছ থেকে এ বাহানা অনুসন্ধান করে যে, তোমরা তার কাছে লজ্জিত হও। এস্তেগফার কর, তাওবা কর। তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করবেন। তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে নিজের গোনাহের উপর লজ্জিত হওয়ার এবং তাওবা করার তাওফীক দান করুন এবং তার রহমতে আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

খোদাভীতি গোনাহের প্রতিবন্ধকতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

দু'টি জান্নাতের ওয়াদা

قال الله تعالى - وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দাড়ানোকে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। (সূরায়ে রহমান, ৪৬)

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয়ানক অবস্থাকে ভয় করে এবং চিন্তা করে যে, আমাকে তো একদিন আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে এবং এক একটি আমলের হিসাব দিতে হবে। এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত।

উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ (রহঃ) ইরশাদ করেন, এই আয়াত দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যার অন্তরে কোন মন্দ কাজ করার খেয়াল আসল যে, অমুক মন্দ কাজটি করে নেই। কিন্তু সাথে সাথে তার আল্লাহর কথা স্মরণ পড়ল এবং ভাবলো যে, আমাকে তো একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এ ধ্যান এবং চিন্তা

আসাতে সে সেই গোনাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করল। এমন ব্যক্তির জন্যই রয়েছে দুটি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।

অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতের অন্য এক তাফসীরে বলেন, এমন কোন ব্যক্তি যে একাকী কোন নির্জন স্থানে থাকে, যেখানে তাকে দেখার মত কেউ নেই। যদি সে কোন গোনাহ্ করতে চায় তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন বাধাও নেই। আর এই নির্জনে থাকাকালীন তার অন্তরে গোনাহের স্বাধও জাগলো, কিন্তু সে ভাবলো, যদিও আমাকে এখানে কোন মানুষ দেখছে না কিন্তু আমার প্রভু তো আমাকে নিশ্চয়ই দেখছেন। আর একদিন আমাকে সে প্রভুর সামনে দাঁড়াতেও হবে। এ সমস্ত খেয়াল আসার ফলে সে গোনাহ থেকে বিরত রইল। তবে এমন ব্যক্তির জন্যই রয়েছে দুটি জান্নাতের ওয়াদা। আর বাস্তবিক পক্ষে 'তাকওয়া' একেই বলে যে, মানুষের অন্তরে গোনাহের স্পৃহা হবে কিন্তু সে এ ভেবে পরিহার করবে যে, যদিও আমাকে দুনিয়ার কেউ দেখছে না কিন্তু আসমান থেকে তো একজন নিশ্চয়ই দেখছেন। আর সমস্ত শরীঅত ও তরীকতের মূলই হচ্ছে অন্তরে এ ভয় প্রবেশ করানো যে, আমাকে একদিন আল্লাহর সামনে দাড়াতে হবে।

আল্লাহর বড়ত্ব

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহতা'আলা একথা বলেননি, যে ব্যক্তি জাহান্নামকে ভয় করে অথবা শাস্তিকে ভয় করে বা আগুনকে ভয় করে, তার জন্য দুটি জান্নাত। বরং বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে। এর অর্থ হচ্ছে যে, তার অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব রয়েছে, এ চিন্তায় নয় যে তিনি শাস্তি দিবেন। কিন্তু চিন্তা হল যে, আমি এ আমল নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াব কিভাবে? যার অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব বা আজমত আছে সে চিন্তা করে যে, হায়! আমি আল্লাহর মর্জির খেলাফ কোন কাজ করে তার সামনে এ চেহারা দেখাবো কেমন করে? আর এভাবে ভয় করার নামই হচ্ছে 'তাকওয়া'।

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) পুরো জীবনে দু'বার ব্যতীত আমাকে কখনও প্রহার করেননি। তবে দু' একবার

থাপ্পর খেয়েছি বলে স্মরণ পড়ে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব, বড়ত্ব আমার অন্তরে এমন ছিল যে, আমি যখন তার রুমের সামনে দিয়ে হেটে যেতাম তখন আমার পা শুধু কাঁপতো। আমি ভাবতাম, এমন কেন হচ্ছে? আমি কার সামনে দিয়ে যাচ্ছি। ভেবে চিন্তে বুঝলাম যে, এর কারণ হচ্ছে, তার চোখের সামনে আমার এমন কোন আমল যেন প্রকাশ না পায়, যা তার বড়ত্ব এবং আদবের পরিপন্থী। যখন মাখলুকের জন্য অন্তরে এত ভক্তি হয়ে থাকে, তবে যিনি সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা, সবার মালিক তার জন্য অন্তরে কতটুকু ভক্তি, আজমত হওয়া উচিত? ভাবা উচিত যে, এত গোনাহ করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব কি করে? এ চেহারা তাকে দেখাব কিভাবে? এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوٰى

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং স্বীয় নফ্সকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

(সূরায়ে নাজিয়াত)

বাস্তবে ভয় করার বস্তু হচ্ছে 'আল্লাহর অসন্তুষ্টি'। কারণ জাহান্নাম ও তার শাস্তিকে এজন্যই ভয় করা হয় যে, এটা আল্লাহর অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ। তাই আসল ভয়ের বস্তু হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর বড়ত্ব। কবি বলেন–

لاتسقى ماء الحياه بذلة

بل فاسقنى بالعز كاس الحنظل

অর্থাৎ, আমাকে অপমানের সাথে আবে হায়াতও পান করাতে যেওনা, অর্থাৎ, আমি সম্মানহারা হয়ে আবে হায়াত (যে পানি পান করলে কিয়ামতের পূর্বে পানকারীর মৃত্যু আসবে না) ও পান করতে প্রস্তুত নই। বরং আমাকে হানজাল (এক ধরনের তিক্ত ফল) নামক তিক্ত ফলও যদি সম্মানের সাথে পান করাও তাতেও আমি প্রস্তুত।

মূলকথা হল মানুষ নিজের সম্মানহানী হওয়াকে পছন্দ করে না। সুতরাং গোনাহ করে কেন নিজের সম্মানকে বিলীন করবে, সে ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত।

আর যারা আল্লাহর পরিচয় যত বেশী জানে, তারা তত বেশী আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে থাকে এবং তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকে। আর যেহেতু জাহান্নাম ও তার শাস্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ তাই একে ভয় করে থাকে। নতুবা বাস্তবে তো ভয়ের বস্তু 'আল্লাহর অসন্তুষ্টি'।

দুধে পানি মিশানোর ঘটনা

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ফারূকে আযম (রাযিঃ) স্বীয় শাসনামলে মানুষের অবস্থা জানার জন্য রাতের বেলা মদীনার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। যদি কারো ব্যাপারে জানতে পারতেন যে, অমুক ব্যক্তি অভাব-অনটনে নিমজ্জিত আছে, তখন তার সাহায্য করতেন। যদি জানতে পারতেন যে, অমুক ব্যক্তি কোন মুসীবতে আছে, তখন তার মুসীবত দূরীভূত করতেন। আর যদি কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখতেন, তবে তা সংশোধন করে দিতেন। একদিন তিনি তাহাজ্জুদের সময় মদীনার এক গলি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ঘর থেকে দু'জন মহিলার কথার আওয়াজ শুনতে পেলেন। আওয়াজ থেকে অনুভব করতে পারলেন যে, একজন বুড়ো অপরজন যুবতী। আর যুবতী মেয়েটি সে বুড়ো মহিলার মেয়ে। সে বুড়ো মহিলা যুবতী মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলছে যে, তুমি যে দুধ দোহন করে এনেছ, এতে কিছু পানি মিশিয়ে নাও। তাহলে দুধের পরিমাণ একটু বেড়ে যাবে। তারপর তা সকালে বিক্রি করে দিবে। উত্তরে সে মেয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারূক (রাঃ) এ আইন জারী করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যেন দুধের সাথে পানি না মিশায়। তাই আমি পানি মিশাতে পারবো না। তখন উত্তরে সে বৃদ্ধা মহিলা বলল, এখানে তো আর আমীরুল মুমিনীন বসে নেই। তিনি হয়ত তার ঘরে আছেন। আর এখন অন্ধকার রাত তাই পানি মিশালে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। কেউ বুঝতেও সক্ষম হবে না যে, তুমি দুধে পানি

মিশিয়েছ। এর উত্তরে সে মেয়ে বলল, আম্মাজান! যদিও আমীরুল মুমিনীন দেখছেন না, কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের আমীর অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাতো নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। তাই আমি একাজ কিভাবে করি? হযরত উমর (রাযিঃ) গেটের বাইরে দাড়িয়ে সব কথা শুনছিলেন। যখন রাত গড়িয়ে সকাল হল। তখন তিনি সে মেয়েটির খোজ-খবর নিলেন। কে এ মেয়ে? যার হৃদয় খোদাভীতিতে ভরপুর। খোজ-খবর নেয়ার পর এই যুবতীর সাথে স্বীয় পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। অতঃপর উভয় দিকের সম্মতিক্রমে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। অবশেষে এ ভাগ্যবতী মেয়েটির বংশধর থেকেই হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আজীজ (রহঃ) জন্ম নিয়েছিলেন। যিনি ছিলেন মুসলমানদের পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ।

সারকথা এ মেয়েটির অন্তরে একথা এসেছিল যে, যদিও আমীরুল মুমিনীন দেখতে পাচ্ছেন না ঠিকই। কিন্তু আল্লাহ তো নিশ্চয়ই দেখছেন। যখন অন্ধকার রাত। নির্জনতা, নিস্তব্ধতা, দেখার মত কেউ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ দেখছেন একথা স্মরণ করাই হচ্ছে 'তাকওয়া'।

শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার হযরত ফারূকে আযম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সফরে ছিলেন। সফরের যা সরঞ্জামাদী ছিল সব ফুরিয়ে গেল। দেখলেন যে, জঙ্গলে ছাগলের পাল চরে বেড়াচ্ছে। আর আরববাসীদের মধ্যে এ নিয়ম ছিল যে, তারা মেহমানদারী হিসেবে মূল্য ব্যতীত দুধ পান করাত। তাই তিনি পালের রাখালের নিকট গিয়ে বললেন, আমি একজন মুসাফির। আমার সফরের সব সরঞ্জামাদি শেষ হয়ে গেছে। তুমি একটি বকরীর দুধ দোহন করে আমাকে দাও, আমি পান করবো। রাখাল উত্তর দিল, আপনি একজন মুসাফির আপনাকে দেয়ার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু সমস্যা হল, এ সমস্ত বকরীর মালিক আমি নই। এগুলোর মালিক অন্য একজন। আমার শুধু এগুলো চরানোর দায়িত্ব। এগুলো আমার নিকট আমানত

স্বরূপ। তাই শরীঅতের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আপনাকে এগুলোর দুধ পান করনো বৈধ মনে করি না।

এরপর হযরত ফারূককে আযম (রাযিঃ) আরও কঠিনভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে বললেন, দেখ ভাই! আমি তোমাকে একটি লাভের কথা বলছি। যার ভিতরে তোমারও ফায়দা রয়েছে, আমারও ফায়দা রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে যে, তুমি এ সমস্ত বকরীগুলো থেকে একটি বকরী আমার নিকট বিক্রি করে দাও। আর এর মূল্য আমার নিকট থেকে নিয়ে নাও। এতে তোমার ফায়দা হল যে, তুমি টাকাগুলো পেয়ে গেলে। আর আমার ফায়দা হল যে, আমি বকরী পেয়ে গেলাম। পথে যেখানেই প্রয়োজন হবে দুধপান করতে পারবো। বাকী রইল মালিক, তুমি গিয়ে মালিককে বলবে, হুজুর একটি বকরীকে বাঘ খেয়ে ফেলেছে আর সে তোমার কথা বিশ্বাসও করবে। কারণ সাধারণতঃ জঙ্গলে বাঘ বকরী খেয়েই থাকে। এভাবে আমরা উভয়েই লাভবান হয়ে যাব। রাখাল এসব প্রস্তাব শুনে বলে উঠলঃ

يا هذا فاين الله

অর্থাৎ, হে ভাই! যদি আমরা এসব করি তবে আল্লাহ কোথায় গেলেন। অর্থাৎ, আমরা ইচ্ছা করলে এ কাজ এখানে করে ফেলতে পারি এবং মালিককেও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবো। কিন্তু এ মালিকের আরও একজন মালিক আছেন। তার কাছে গিয়ে কি জবাব দেব? তাই আমি এ কাজ করার জন্য প্রস্তুত নই।

হযরত উমর (রাযিঃ)-এর পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই যখন তিনি রাখালের এ জবাব শুনলেন, তখন বলে উঠলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মত মানুষ এ পৃথিবীতে বাকী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জালেম অন্যের উপর জুলুম করতে পারবে না। কারণ যতক্ষণ মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয়, আখেরাতের চিন্তা, আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে জবাবদেহীর কথা স্মরণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যায় ও জুলুম করতে পারবে না। আর বাস্তবে এটাকেই 'তাকওয়া' বলে।

অন্যায় প্রতিরোধ করার উত্তম পন্থা

মনে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে খোদাভীতির মশাল না জ্বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে পাপ নির্মূল হবে না। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, খুন, রাহাজানি বন্ধ হবে না। এগুলো বন্ধ করার জন্য যদি শত শত পুলিশের পাহারা লাগানো হয়। অথবা অনেক অভিজ্ঞ বিচারক নিযুক্ত করা হোক। তবুও বা বন্ধ হবে না। কারণ এ পুলিশ এবং বিচারক বেশী থেকে বেশী হলে শহরের অনুকূলে দিনের আলোতে অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। কিন্তু রাতের আধারে, গভীর নির্জন জঙ্গলে মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে শুধুমাত্র একটিই বস্তুই পারে। সেটি হচ্ছে তাকওয়া বা খোদাভীতি। তাকওয়া ও খোদাভীতি ছাড়া অন্যায় থেকে বিরত রাখার কেউ নেই।

আর যখনই মানুষের অন্তর থেকে এ বস্তুটি দূর হয়ে যায়, তখন মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। যার জ্বলন্ত প্রমাণ আজকের সমাজ ব্যবস্থা। আজ অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে পুলিশ নিযুক্ত করা হয়েছে। আবার সে পুলিশের নেগারানীর জন্য উর্ধ্বতন পুলিশ বা সার্জেন্টও নির্ধারিত করা হয়েছে। আবার অন্য দিকে বিচারক নিযুক্ত করা আছে। আবার সেই বিচারকদের উপর উচ্চ পর্যায়ের ম্যাজিস্ট্রেট আছে। আইনের উপর আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। কিন্তু আজ সে আইন দু' পয়সা মূল্যে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। অথচ আদালত তার স্থানে কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশও তার স্থানে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্নীতি ও ঘুষের লেন-দেন বন্ধ করার জন্য দুর্নীতি দমন সংস্থা কায়েম করা হয়েছে এবং এজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু অবস্থা হল যে, খোদ এই সংস্থার লোকেরা ঘুষ খাচ্ছে। আর কত বিচার বিভাগ তৈরী করবে? আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোন ফর্মূলা তৈরী হয়নি যা পাপকে সমূলে উৎপাটন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা এমন বস্তু যার মাধ্যমে পাপের উৎপাটন হতে পারে এবং জুলুম, নির্যাতনও বন্ধ হতে পারে।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ও তাকওয়া

অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি করা এমন এক হাতিয়ার, যা মানুষকে সব ধরনের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ ভীতি ও তার অনুভব আল্লাহ

তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এমনভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, যদি কোন সময় তাদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের গোনাহ হয়ে যেত তখন তারা অস্থির হয়ে পড়তেন এবং বলতেন, হায়! আমার পক্ষ থেকে এত বড় অন্যায় হয়ে গেল? যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের উপর শরীঅত প্রদত্ব শাস্তি প্রয়োগ করতে না পারতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে স্বীয় অপরাধের জন্য তাওবা করতে না পারতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের স্থীরতা ফিরে আসতো না। দেখা যেত, অন্যায়কারী স্বয়ং এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাঁর উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে অনুরোধ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে যে কোনভাবে হোক পবিত্র করুর্ন।

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহর ভয়, আখেরাতের চিন্তা সৃষ্টি না হবে এবং আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়ার সে ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা অন্তরে জাগ্রত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দুনিয়া থেকে পাপাচার বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তার জন্য যত কলা-কৌশলই অবলম্বন করা হোক না কেন সফল হওয়া যাবে না।

আমাদের বর্তমান আদালত

কয়েক বৎসর হল আমার আদালতের সাথে সম্পর্ক হয়েছে। কানুন অনুযায়ী চুরি, ডাকাতির যে সমস্ত মোকাদ্দামা হয়ে থাকে, সেগুলোর সর্বশেষ আপীল আমাদের আদালতে আসার কথা। কিন্তু প্রথম তিনটি বৎসর এমনভাবে অতিবাহিত হল যে, চুরি-ডাকাতির বিষয়ে কোন মুকাদ্দামাই আমাদের নিকট আসেনি। আমিতো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অতঃপর আমি জানতে চাইলাম যে, এ পর্যন্ত আমাদের এ আদালতে চুরি-ডাকাতি সম্বন্ধে কয়টি মুকাদ্দামা এসেছে? উত্তর পেলাম, মাত্র তিন থেকে চারটি মুকাদ্দামা এসেছে। আমি বললাম, কোন মানুষ যদি এ হিসেব শুনে যে, তিন বৎসরে সুপ্রীম কোর্টে চুরি-ডাকাতি সম্পর্কে মাত্র তিন থেকে চারটি মুকাদ্দামা এসছে তখন সে বুঝবে যে, এটাতো কোন মানুষের নয় বরং ফেরেশতাদের এলাকা। খুবই নিরাপদ এলাকা। পক্ষান্তরে যদি

পত্রিকার পৃষ্ঠা খোলা হয়, তবে দেখা যাবে যে, প্রতিদিন চুরি-ডাকাতি সংক্রান্ত ঘটনা পঞ্চাশের কম হবে না। অতঃপর আমি আরও খোজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, চুরি-ডাকাতির সমস্ত মুকাদ্দামা কোর্টে উঠার পূর্বেই ঘুষের আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়ে যায়। এই হল আমাদের বর্তমান আদালতের অবস্থা। আর এই ভয়াবহ অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে, অন্তর থেকে খোদাভীতি ও আখেরাতের চিন্তা বিলুপ্ত হওয়া।

উপদেশমূলক ঘটনা

আমার আদালতের দায়িত্বের তিন বৎসরের মধ্যে ডাকাতির একটি মামলা আমার নিকট এসেছিল। এর ঘটনাটি ছিল এই যে, এক লোক 'কুয়েত' চাকুরী করত। ছুটিতে করাচী আসছিল। করাচী এয়ারপোর্টে নামার পর বাসায় যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করল। অতঃপর এর মধ্যে নিজের সব মালামাল রেখে বসে পড়ল। পথ চলতে চলতে যখন বাহাদুরপুরের চৌরাস্তায় এসে পৌছলো, সেখানে অশ্বারোহী একদল পুলিশের সাথে তার সাক্ষাত হয়। রাত তখন তিনটে। পুলিশ তার গাড়ি আটক করে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, কোথা থেকে এসেছো? কোথায় যাচ্ছ? সে উত্তর দিল, কুয়েত থেকে এসেছি। আর এখন এয়ারপোর্ট থেকে আমার বাড়ি যাচ্ছি। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করল, তুমি সেখান থেকে কি কি বস্তু এনেছো? উত্তরে সে বলল, আমি যা যা এনেছি সেগুলোর পরিক্ষা নিরীক্ষা কাস্টম অফিসার করেছেন। আপনাদের পরীক্ষা করার মত তেমন কিছু নেই। অবশেষে এক পুলিশ তার দিকে বন্দুক তাক করে বলল, তোমার কাছে যা কিছু আছে সবকিছু বের করে আমাদেরকে দিয়ে দাও।

এটাই প্রথম মুকাদ্দামাহ যা আমার নিকট এসেছিল যে মুকাদ্দামায় আশ্চর্যের বস্তু এটাই ছিল, যে পুলিশকে নিযুক্ত করা হয়েছিল মানুষের জান-মালকে চোর-ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, সে পুলিশই বন্দুক ঠেকিয়ে মানুষের মাল ছিনিয়ে নিচ্ছে। যারা ছিলো আইন-কানুনের রক্ষক, যারা ছিল নিরাপত্তাদাতা, তারাই সে আইন কানুনের পায়ে কুঠারাঘাত করছে। আর এর মূল কারণ এটাই যে অন্তর থেকে আল্লাহর

ভয় বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর অনুভবটুকু হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ ভুলে গেছে যে, আমাকে একদিন মরতে হবে, মৃত্যুর পর আমার এক নতুন জীবন শুরু হবে, যার শুরু আছে শেষ নেই। তাই মানুষ অন্যায়, অনাচার ও পাপাচার করতে কোন দ্বিধাবোধ করছে না।

আর মনে রাখবেন, খোদাভীতির এ অনুভব শক্তি কিন্তু একদিনেই মিটে যায় না। বরং ধীরে ধীরে সে অনুভব শক্তি হারিয়ে যায়। আর তা এভাবে যে, শয়তান মানুষকে বড় ধরনের কোন মন্দ কাজ করার জন্য প্রথমবারেই উদ্বুদ্ধ করে না। অর্থাৎ শয়তান কোন মানুষকে প্রথমবারেই বলে না যে, যাও তুমি ডাকাতি কর। কারণ যদি প্রথমবারেই বড় ধরনের মন্দ কাজ করার জন্য বলে, তখন মানুষ তাতে সম্মত নাও হতে পারে। তাই সে প্রথম প্রথম ছোট ছোট গোনাহে লিপ্ত করায়। যেমন, প্রথমে বলে যে, নাজায়েয স্থানে দৃষ্টি ফেল, এতে আনন্দ পাবে। এভাবে মানুষ যখন ছোট ছোট গোনাহে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন বলে আরে! যখন তুমি অমুক অমুক গোনাহ করেছিলে, তখন তো তোমার মনে একথা আসেনি যে, তোমাকে একদিন আল্লাহর কাছে যেতে হবে, তোমাকে একদিন মরতে হবে। সে সময় যেহেতু তোমার মনে একথা আসেনি তাই এখন তুমি এ দ্বিতীয় গোনাহটিও করে নাও। অতঃপর তৃতীয় গোনাহ, অতঃপর চতুর্থ গোনাহর উপর উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে মানুষ অনেক ধরনের ছোট ছোট গোনাহের কাজে অভ্যস্থ হওয়ার পর শয়তান তাকে বলে, যখন তুমি এতসব গোনাহ করতে পেরেছো, তাই এখন একটি বড় গোনাহ করতে অসুবিধা কোথায়? আর এভাবে মানুষ বড় বড় গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অনায়াসে পাপাচারে নিমজ্জিত হয়। যার প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে অন্তর থেকে খোদাভীতি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আজকের টিভি ও যুবক সমাজ

আজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, যুবকরা হাতে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ পিস্তল ঠেকিয়ে কারো মাল ছিনিয়ে নিচ্ছে। কারো জান ছিনিয়ে নিচ্ছে। কারো ইজ্জত লুণ্ঠন করছে। এ সকল কাজ কি তারা পূর্বে

করতো? না কখনও নয়। আর এর সূচনা হয়েছে এভাবে যে, শয়তান এদেরকে সর্বপ্রথম প্রবঞ্চনা দিল যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ টিভি দেখে আনন্দ অনুভব করছে, তোমরা কেন বঞ্চিত হচ্ছো? যাও! তোমরাও টিভি দেখো। ফিল্ম দেখো, আমোদ-প্রমোদ কর। আর এর মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে গোনাহের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। আর টিভির প্রতিক্রিয়া তাদের অন্তরে এই হয়েছে যে, তারা ভাবছে, যখন আল্লাহকে ভুলে, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর অনুভবটুকু হারিয়ে এই গোনাহের কাজ করার দুঃসাহস পেয়েছি, ফিল্ম দেখতে পেরেছি, তবে আরও একটু আগে বাড়তে অসুবিধা কি? আর শয়তান বলে, তুমি তো অমুক অমুক ফিল্মে এমন এমনভাবে এ্যাকশন করতে দেখেছো, এখন একটু বাস্তব পরীক্ষা করে নাও। ব্যস! আর তো কিছু নয়। এভাবেই তাকে বড় বড় গোনাহে লিপ্ত করে দেয়।

আর মনে রাখবেন! সাধারণতঃ বড় গোনাহগুলো ছোট গোনাহের পরই হয়ে থাকে। শয়তানের পক্ষ থেকে প্রথমে ছোট গোনাহের দুঃসাহস দেখানো হয়, এরপর বড় গোনাহের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ এ সকল যুবকের এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমরা তো সর্বদাই দুনিয়াতে থাকবো, কখনও এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে না। কেননা গোনাহে অভ্যস্ত হওয়ার দরুণ অন্তর থেকে আল্লাহতা'আলার সম্মুখে দাঁড়ানোর অনুভূতিও দূর হয়ে গেছে। তাই এখন বড় বড় গোনাহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। যে গোনাহই ইচ্ছা হচ্ছে করছে।

الشر يبداه فى الاصل اصغره

অর্থাৎ, বড় ধরনের অন্যায়ের সূচনা ছোট অন্যায় থেকেই হয়ে থাকে। যেমন, একটু আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে অনেক বড় ধরনের আগুন লেগে যায়। তাই কোন গোনাহকে ছোট মনে করে তাতে জড়িত হতে যাবেন না। মনে করবেন না যে, এটা খুব ছোট গোনাহ। কারণ এটা শয়তানের টোপ যা সে আপনাকে তার ষড়যন্ত্রের জালে শিকার করার জন্য ব্যবহার করছে, আপনাকে তার কন্ট্রোলে নেয়া এবং আপনার অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় এবং আখেরাতের চিন্তাকে দূর করে দেয়ার জন্য আপনার পেছনে লেগে

পড়েছে। তাই গোনাহ ছোট হোক আর বড় হোক উভয়টিকেই আল্লাহর ভয়ে পরিহার করুন।

গোনাহ কবীরা না সগীরা?

হাকীমুল উম্মত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, মানুষ অনেক আগ্রহ নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে, হযরত! 'অমুক গোনাহটি' কবীরা না সগীরা? জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য হলো– যদি সগীরা হয় তবে করে ফেলবে, আর যদি কবীরা হয়, তবে একটু ভয় ও ইতস্ত অনুভব করবে।

হযরত থানভী (রহঃ) ইরশাদ করেন, সগীরা ও কবীরা গোনাহের দৃষ্টান্ত হল এমন যে, একটি আগুনের ছোট স্ফুলিঙ্গ। আর অপরটি আগুনের বড় কুণ্ডলি। আপনারা কি কখনও কাউকে দেখেছেন যে, সে আগুনের ছোট একটি স্ফুলিঙ্গ বাক্সে রেখে দেয়! কোন বিবেকবান ব্যক্তিই এ কাজ করবে না। কারণ সে ক্ষুদ্র আগুনের টুকরোটি একটু পরেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের রূপ ধারণ করবে এবং বাক্সের সবকিছু জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দিবে এবং সে বাক্সকেও জ্বালিয়ে দিবে। এমনও হতে পারে যে, পুরো ঘরকে জ্বালিয়ে ফেলবে। ঠিক গোনাহের দৃষ্টান্তও এমন যে, সেটি ছোট হোক আর বড় হোক, তা আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ। যদি আপনি নিজ ইচ্ছা একটি গোনাহও করেন, হতে পারে এ একটি গোনাহই আপনার পুরো জীবনের পূঁজিকে বিনষ্ট করে দিবে। তাই এ চিন্তা করতে যাবেন না যে এটি ছোট গোনাহ না কি বড় গোনাহ? বরং এ চিন্তা করুন যে, এটি গোনাহ! না কি গোনাহ নয়? জায়েয কি জায়েয নয়? আল্লাহ তা'আলা এতে নিষেধ করেছেন কি না? আর যখন জানতে পারবেন যে, আল্লাহতা'আলা এ কাজ থেকে বারণ করেছেন, তখন আল্লাহর সামনে জবাবদিহীর কথা স্মরণ করে অনুধাবন করুন যে, আমি এ গোনাহ করে আল্লাহর সামনে চেহারা দেখাবো কেমন করে?

সারকথা উপরে উল্লেখিত আয়াতের সত্যায়নকারী হওয়ার এটাই পন্থা যে, যখনই অন্তরে কোন গোনাহের স্বাধ জাগবে তখনই আল্লাহর সামনে দাড়ানোর কথা স্মরণ করে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।

যদি আব্বু দেখে ফেলেন!

আমাদের শায়খ হযরত ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ) বলতেন, মানুষ যখন আল্লাহর ধ্যান করতে চায়, অনেক সময় তা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। কারণ মানুষ সাধারণতঃ ঐ সমস্ত বস্তুর কল্পনা করতে পারে যা সে আগে দেখেছে। কিন্তু আল্লাহতা'আলা তো এমন নয় যাকে সচরাচর দেখা যায়। তাই আল্লাহতা'আলার ধ্যান করা একটু কঠিন। কিন্তু যখন অন্তরে গোনাহের ইচ্ছা হয় তখন একটু চিন্তা করুন যে, আমি যে গোনাহ করার ইচ্ছা করেছি। যদি এ গোনাহ করার সময় আমার আব্বু আমাকে দেখে ফেলেন। অথবা যদি আমার ছেলে-সন্তান, আমার উস্তাদ, আমার কোন ছাত্র, আমার কোন খাদেম বা আমার কোন বন্ধু-বান্ধব দেখে ফেলে তবে কি আমি তাদের সম্মুখে এ গোনাহ করতে পারতাম? যেমন আপনার মন চাইল কোন নাজায়েয স্থানে দৃষ্টি দিতে, ঐ সময় একটু চিন্তা করুন যে, এ সময় যদি আমার শায়খ, (পীর) আমার উস্তাদ বা আমার কোন ছেলে-সন্তান বা ছাত্র দেখতো তবে কি আমি তাদের সম্মুখে এ অপাত্রে দৃষ্টি দিতে পারতাম? এটাই বাস্তব যে, আমি তাদের সামনে তা করতে পারতাম না। আর না পারার কারণ, মনের ভয়, হায়! তারা যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখে তবে খুব খারাপ বলবে। খারাপ ভাববে। সুতরাং যখন একজন সাধারণ মানুষের সামনে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে নিজের নফসকে কন্ট্রোল করা যেতে পারে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। তবে প্রত্যেক গোনাহের সময় এ চিন্তা করবে যে, মহান আল্লাহ যিনি সব কিছুর মালিক, তিনি আমাকে দেখছেন। তার সামনে আমি গোনাহ করবো কিভাবে? এভাবে ধ্যান করলে আল্লাহতা'আলা অন্তর ও গোনাহের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

যুবক বয়সে ভয় আর বৃদ্ধ বয়সে আকাঙ্খা

একজন মুমিনের জন্য উচিত, সে সর্বদা আল্লাহতা'আলাকে ভয় করবে। সাথে সাথে আশাও রাখবে। কিন্তু বুযুর্গগণ বলেন, যুবক বয়সে আল্লাহরভীতি প্রবল থাকা শ্রেয়। কারণ যুবক বয়সে যখন মানুষের হাত পা

ভাল থাকে, শক্তি পরিপূর্ণ থাকে, তখন মানুষ যা চায় তাই করতে পারে। আর সে বয়সে গোনাহের স্বাধও বেশী জেগে থাকে। তাই সে সময় অন্তরে আল্লাহর ভয়ও বেশী রাখা উচিত। কারণ খোদাভীতি মানুষকে গোনাহের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং শেষ বয়সে এসে পৌছে, তখন আল্লাহর দরবারে ভরসা করা উত্তম। তাহলে নৈরাশ্যের শিকার হতে হবে না।

দুনিয়ার শৃঙ্খলা ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত

আজ মানুষ মনে করে খোদাভীতি এমন কোন জিনিস নয় যেটাকে অর্জন করার প্রয়োজন আছে? যেমন অনেকে বলে থাকে, আরে! আল্লাহ তো আমাদেরই। তাঁকে আবার কি ভয় করবো? তিনি তো আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি বার বার কুরআনে ইরশাদ করেছেন, তিনি 'ক্ষমাশীল', 'পরম দয়ালু'। সুতরাং আর তাকে ভয় কেন করবো?

কাজেই যদি এসব কথা চিন্তা করা হয়, তবে আল্লাহ তা'আলার ভয় অন্তরে সৃষ্টি করার প্রয়োজন অনুভুত হবে না। এ চিন্তার ফলেই আজ মানুষ উদাসীনতার পোষাক পরে গোনাহের মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মনে রাখবেন, 'ভয়' এমন বস্তু যা না হলে দুনিয়ার কোন কাজ-কর্মই সঠিকভাবে পরিচালিত হতো না। যদি ছাত্রদের পরীক্ষায় ফেল করার ভয় না হত, তবে তারা কখনও মেহনত করতো না। এ ভয়ই তাদের মেহনত করাচ্ছে, তাদের পড়াচ্ছে। যদি কারো চাকুরী থেকে বরখাস্ত হওয়ার ভয় না থাকতো, তবে সে সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতো না। শুধু বসে বসে সময় নষ্ট করতো। ছেলের যদি পিতার ভয় না থাকতো, চাকরের যদি মনিবের ভয় না থাকতো, সাধারণ মানুষের যদি আইন-কানুনের ভয় না থাকতো, তবে দুনিয়ার সবকিছু বিশৃংখল হয়ে যেত। আর দুনিয়ায় কারো হক রক্ষিত থাকতো না। আজ আপনারা নিরাপত্তাহীনতা, অরাজকতা ও অস্থিরতার যে প্রবল বায়ূ প্রবাহিত হতে দেখছেন, তা এজন্যই। আজ না আছে মালের নিরাপত্তা না আছে জানের নিরাপত্তা, আর

না আছে সম্মানের নিরাপত্তা। আজ চুরি-ডাকাতি অবাধে চলছে। আজ মানুষের জান মশা-মাছির জান থেকেও নিম্ন পর্যায়ের হয়ে পড়েছে। এর কারণ হল যে, মানুষের অন্তর থেকে 'খোদাভীতি' উঠে গেছে। সাথে সাথে আইনের ভয়ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ আজকের কানুন দু' পয়সায় বিক্রি হয়। সুতরাং যত অন্যায়ই করুক কোন অসুবিধা নেই। কারণ পয়সা থাকলে তো আইন-কানুন সে (অপরাধীই) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে! তাই আজ সমাজের এ দুরাবস্থা।

স্বাধীনতা আন্দোলন

যখন ভারত বর্ষে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল, তখন মুসলমান ও হিন্দুরা উভয়ে এক সাথে মিলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে হরতাল, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি করতো। যেহেতু হিন্দু ও মুসলমানরা এক সাথে মিলে আন্দোলন করতো, তাই কোন কোন সময় মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের কাজও করিয়ে নেয়া হত। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দুদের মাঝের ভেদাভেদটুকুও দূর হয়ে যেত। যেমন কখনও যদি হিন্দুদের কোন জলসা হত, তখন মুসলমানরাও তাদের মত নিজেদের মাথায় টিকা লাগাত এবং তাদের মন্দিরে গিয়ে তাদের বদ রুসূমে শরীক হতো। আন্দোলনের ভিতর দিয়ে এ সমস্ত কাজও হত। আন্দোলন করতে গিয়ে যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে হযরত থানভী (রহঃ)-এর তা মনোপুত হয়নি, তাই তিনি এ আন্দোলন থেকে আলাদা থাকতেন এবং নিজের মুরীদ ও ভক্তবৃন্দকে বলতেন যে, আমার মতে এ আন্দোলনে শরীক হওয়া সঠিক নয়।

একবার এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মেহমান হয়ে হযরত থানভী (রহঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হযরত! আপনি যদি এ আন্দোলনে শরীক হতেন, তাহলে ইংরেজদেরকে খুব দ্রুত তাড়ানো সম্ভব হত। আপনি যেহেতু এ আন্দোলন থেকে দূরে আছেন, তাই ইংরেজদের হুকুমত এখনও টিকে আছে। তাই আপনিও আমাদের সাথে এ আন্দোলনে শরীক হোন। উত্তরে থানভী (রহঃ) বললেন,

আন্দোলন করতে গিয়ে আপনারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা আমার মনোপুত হচ্ছে না। সুতরাং আমি আপনাদের সাথে অংশগ্রহণ করি কিভাবে? আপনারা বলুন, কয়েক বৎসর যাবত আপনারা এ আন্দোলন করে যাচ্ছেন, সমাবেশ করছেন, মিছিল করেছেন, হরতাল করেছেন এ সমস্ত কাজের দ্বারা আপনারা কি ফায়দা অর্জন করেছেন। তখন নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিল, হযরত যদিও এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি, তবে অনেক বড় একটি ফায়দা হয়েছে। আর সে ফায়দা হল যে, মানুষের অন্তর থেকে লাল টুপির ভয় চলে গেছে (সে সময় পুলিশরা লাল টুপি পরিধান করতো তাই লাল টুপি বলে, পুলিশকে বুঝানো হত)। এখন আর কারো মনে পুলিশের কোন ভয় নেই। আগে যদি কোন পুলিশ আসার সংবাদ পাওয়া যেত, তখন পুরো মহল্লা গরম হয়ে যেত। এখন আমরা আন্দোলন করে অন্তর থেকে এ লাল টুপির ভয় দূরীভূত করতে সক্ষম হয়েছি। এটা তো আমাদের অনেক বড় ফায়দা। এভাবে আমরা ধীরে ধীরে আগে বেড়ে একদিন ইংরেজদেরকেও বিতাড়িত করতে সক্ষম হব।

একথার জবাবে হযরত থানভী (রহঃ) খুবই হেকমতপূর্ণ একটি কথা বলেছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা অন্তর থেকে লাল টুপির ভয় দূর করেছেন? এটা তো খুবই খারাপ কাজ করেছেন। কারণ লাল টুপির ভয় অন্তর থেকে দূর করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, চোর-ডাকাতের পথকে সুগম করে দেয়া। এখন চোর নির্ভয়ে চুরি করবে। ডাকাত ডাকাতি করবে অন্তরে পুলিশের কোন ভয়-ই থাকবে না। যদি আপনারা লাল টুপির ভয় অন্তর থেকে দূর করার সাথে সাথে আপনাদের সবুজ টুপির ভয়ও অন্তরে ঢুকাতে পারতেন, তবে সেটাকে সফলতা বলা যেত। কিন্তু আপনারা তা করতে পারেননি। যার প্রেক্ষিতে আজ সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতা শুরু হয়ে গেছে। মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর হিফাযত দুষ্কর হয়ে পড়ছে। আপনারা কি এটা কোন ভাল কাজ করেছেন? আমি কি আপনাদের এ কাজকে ভাল বলতে পারি?

এটা তো ঐ সময়কার কথা যা হযরত থানভী (রহঃ) আজ থেকে ষাট বৎসর পূর্বে বলে গেছেন। কিন্তু তা আজ আমরা বাস্তবে খোলা চোখে

অবলোকন করতে পারছি। আজ যখন অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় চলে গেছে তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার ঝড়-তুফান বইতে শুরু করেছে। অথচ পূর্বে এমন ছিল যে, যদি কোন এলাকায় কোন একজন লোককে হত্যা করা হতো, তখন পুরো দেশে কম্পন শুরু হয়ে যেত যে, এ ব্যক্তিকে কিভাবে, কেন হত্যা করা হল? এবং এর তালাশ-তদন্ত শুরু হতো পুরোদমে। কিন্তু আজ মানুষের জান মশা-মাছির জান থেকেও মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। কারণ সে ভয় আমাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে গেছে।

আল্লাহর ভয়

আল্লাহর ভয় এমন বস্তু যার ফলে পুরো পৃথিবীর পরিবেশ শান্ত থাকতে পারে। আর যদি এ ভয় চলে যায়, তবে সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতা, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। তাই আল্লাহতা'আলা কুরআনে কারীমে اِتَّقُوا اللّٰهَ، اِتَّقُوا اللّٰهَ। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর (তাকওয়া অর্জন কর) বাক্যটি বার বার বলেছেন। তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ভয়ে সমস্ত গোনাহ পরিহার করা। দুনিয়ার পরিবেশ যেমনিভাবে ভয়-ভীতি ব্যতিরেকে শান্ত থাকতে পারে না। তেমনই দ্বীনের ভিত্তিও আল্লাহর ভয়ের উপর। এ ভয় যখন অন্তর থেকে দূর হয়ে যায় তখনি গোনাহের বৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করে। যা আজ আপনারা চর্ম চোখে দেখতে পাচ্ছেন। কুরআনে কারীমে আল্লাহতা'আলা কোথাও জান্নাতের কথা উল্লেখ করেছেন, কোথাও জাহান্নামের কথা, আবার কখনও শুধু আযাবের কথা, আবার কোথাও তার বড়ত্ব ও কুদরতের কথা ব্যক্ত করেছেন। যেন মুসলমানগণ এ কথাগুলো বার বার চিন্তা করে এবং এগুলোর ধ্যান করে অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি করে।

নির্জনতার সময় খোদাভীতি

পুলিশের ভয়, কানুনের ভয়, জেল-জুলুমের ভয়, এমন বস্তু যা অন্যের সামনে মানুষকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখে। কিন্তু যখন অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তা মানুষকে জঙ্গলের নির্জনতায়ও রাতের অন্ধকারে গোনাহ থেকে বিরত রাখে। তখন রাতের অন্ধকারে,

জঙ্গলের নির্জনতায়, বাস্তবিক পক্ষেই মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়েই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যখন দেখার মত কেউ থাকে না। এছাড়া অন্য কোন বস্তু তাকে গোনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে না।

রোযা অবস্থায় খোদাভীতি

অন্তরে খোদাভীতি আছে কিনা তার চরম প্রমাণ হল রমযান মাস। মানুষ যত বড় গোনাহগার বা ফাসেকই হোক না কেন, সাধারণতঃ রমযান মাসে রোযা রাখে। রোযা যখন প্রচণ্ড গরমের দিনে হয়, তখন খুব পিপাসা লাগে, মনে হয় জিহ্বা বের হয়ে পড়বে, এ অবস্থায় কেউ যদি কোন রুমের ভিতরে থাকে আবার রুমের দরজাও বন্ধ থাকে, তখন দেখার মত কেউ নেই, ঘরে ফ্রিজ রয়েছে, আবার ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানীয়ও রক্ষিত আছে, তখন তো মন চায় যে, ফ্রিজ থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি পান করে নেই। কিন্তু কোন রোযাদার কি এমন কাজ করতে রাজী হবে? কখনও নয়। অথচ যদি সে পানি পান করে নিত, দুনিয়ার কোন মানুষ সামান্যও টের পেত না এবং সে কারো পক্ষ থেকে কোন তিরস্কারেরও শিকার হত না এবং মানুষের সামনে সে একজন রোযাদার হিসেবেই গণ্য হত। আর সন্ধ্যা বেলা যদি রোযাদারের সঙ্গে ইফতার করে নিত, তাহলে কেউ বুঝতো না যে, সে রোযা ভঙ্গ করেছে। কিন্তু এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ রোযা ভাঙ্গতে রাজী নয়।

এখন বলুন, কোন বস্তু তাকে বন্ধ রুমে পানি পান করা থেকে বিরত রেখেছে? শুধু আল্লাহর ভয়। এছাড়া অন্য কোন বস্তু নয়। আমরা যেহেতু রোযা রাখি তাই সে ভয় আমাদের অন্তরে গেঁথে গেছে।

শরীঅতের দাবী হল, যেভাবে রোযার সময় আল্লাহর ভয় আপনাকে পানি পান করা থেকে বিরত রেখেছে, ঠিক তেমনিভাবে যখন আপনার মন অপাত্রে দৃষ্টি দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহর ভয়ে আপনার মনকেও ফিরিয়ে রাখতে হবে.। এমনিভাবে গীবত ও মিথ্যা বলতে মন চাইবে, সেটাকেও আপনার বাধা দিতে হবে। আর এটাকেই প্রকৃতপক্ষে

বলা হয় 'আল্লাহর ভয়'। এটা যখন মানুষের অন্তরে জন্মে যায়, তখন মানুষ আল্লাহকে নারাজ করে কোন গোনাহ-ই করতে পারে না।

জান্নাত কার জন্য?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوٰى

(سورة النازعات)

আল্লাহতা'আলা কত সুন্দরভাবে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রভুর সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় করে (এবং সে ভাবে) কোন একদিন আমাকে আমার প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। তখন কোন মুখ নিয়ে তার সামনে যাব। আর এ ভয় তার মাঝে এত প্রবল হয়ে দাঁড়ায় যে, সে তার নফসকে অবৈধ খায়েশাত থেকে বিরত রাখে। তবে এমন ব্যক্তির ঠিকানাই হল জান্নাত।

(সূরা নাজিয়াত)

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

ان الجنة خفت بالمكارة

অর্থাৎ, জান্নাতকে এমন বস্তু দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে, যা করতে মানুষ কষ্ট মনে করে। আর যত ধরনের দুঃখ ও কষ্টদায়ক কাজ দ্বারা জান্নাতকে পরিবেষ্টিত করা হয়েছে, আপনারা যদি সে কাজগুলো করেন, তবে আপনারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। তাই তো বলা হয় যে, অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করুন। এর ফলে অবৈধ খায়েশাতের উপর আমল করা থেকে বিরত থাকতে পারবেন এবং জান্নাত অর্জন করতে সক্ষম হবেন। আর সে ভয় যেন এমন পর্যায়ের হয় যে, প্রত্যেক কাজ করতে গিয়ে এ চিন্তা আসে যে, আমার এ কাজ আমার প্রভুর সন্তুষ্টির পরিপন্থী হচ্ছে কিনা? সাহাবায়ে কেরামের খোদাভীতির অবস্থা এমন ছিল যে, তাদের পক্ষ থেকে কোন ভুল হয়ে গেলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে নিজের উপর শরীঅত প্রদত্ত্ব শাস্তি প্রয়োগ না করতে পারতেন ততক্ষণ তারা অস্থির থাকতেন। আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মত আল্লাহভীতি দান করুন।

নেক বান্দাদের অবস্থা

আল্লাহর ভীতি যদি কারো অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে তা ধীরে ধীরে এমন প্রবলতর হয়ে পড়ে যে, তখন শুধু এ ভয় হয় না যে, হায়! আমার পক্ষ থেকে না জানি কি গোনাহ হয়ে যায়। বরং তখন এ ভয়ও শুরু হয়ে যায় যে, হায়! আমি যে ইবাদত করছি তা কি আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হচ্ছে? আমার এ ইবাদত কি আল্লাহর দরবারে পেশ করার যোগ্য? অথচ সে এমন ইবাদত করছে যা বাস্তবেই আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টি বিধায়ক। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ভয় পাচ্ছে, হায়! আমার আমল কি যথাযথভাবে পালন হচ্ছে? না কি কোন বে-আদবী হচ্ছে? বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, মুমিনের কাজ-ই হচ্ছে, সে আল্লাহর ইবাদত করবে সাথে সাথে ভয়ও করবে। পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

تَتَجَافٰى جُنُوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدعُونَ رَبَّهُم خَوفًا وَّطَمَعًا

অর্থাৎ, আমার নেক বান্দাদের পরিচয় হল যে, তাদের পার্শ্বদেশ রাত্রের বেলায় বিছানা থেকে পৃথক থাকে। তারা আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে থাকে। কিন্তু সে সময়ও তাদের অন্তর আল্লাহর ভয় শূন্য হয় না। বরং তখনও তারা নিজের প্রভুকে ভয়ের সাথে ডাকতে থাকে এবং ভাবে যে হায়! আমার এ আমল কি আল্লাহর দরবারে কবুল হবে?

অন্য এক স্থানে সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছেঃ

كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْاَسحَارِهِم يَستَغفِرُونَ

অর্থাৎ, সৎ লোকদের অবস্থা হল, তারা রাতে খুব কম ঘুমায়। বরং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকে। তাহাজ্জুদ নামায পড়ে। কিন্তু যখন সাহরীর সময় হয়, তখন তারা এস্তেগ্‌ফার করে।

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হুযূর! সাহরীর সময় তো এস্তেগফার করার কথা নয়। কারণ এস্তেগ্‌ফার তো করা হয় সাধারণতঃ কোন গোনাহের পর। কিন্তু সে বান্দাতো সারারাত্র আল্লাহর দরবারে

দাঁড়িয়ে ইবাদত করছিল। কোন গোনাহ তো সে করেনি, তবে এস্তেগফার কেন করবে?

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে সমস্ত বান্দারা ইবাদতে লিপ্ত থেকেও এস্তেগফার করে। অর্থাৎ, তারা ভাবে যে, যেভাবে ইবাদত করার প্রয়োজন ছিল সেভাবে তো পারিনি। যতটুকু হক আদায় করে ইবাদত করার প্রয়োজন ছিল ততটুকু হক আদায় হয়নি। তাদের শুধু গোনাহের ভয়-ই হয় না। বরং ইবাদত সঠিক মত হচ্ছে কি না সে ব্যাপারেও ভয় হয়।

আর ভয়ের ব্যাপারে নিয়ম এটাই যে, যার অন্তরে আল্লাহর যত বেশী পরিচয় থাকবে, তার অন্তরে তত বেশী আল্লাহর ভয় থাকবে। আর যে যত বেশী আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে, সে তত কম আল্লাহকে ভয় করবে। যেমন একটি ছোট বাচ্চা, যার এখনও কোন কিছু সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞান নেই। তার সামনে যদি কোন বাদশাহ বা মন্ত্রী বা হিংস্র বাঘই এসে পড়ে তবুও সে এদের দেখে ভয় পাবে না। কারণ এদের সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বাদশাহ্ সম্পর্কে জানে এবং তার যথাযথ মর্যাদা বুঝে, তার বাড়ীতে যদি বাদশাহ্ এসে পড়ে তবে সে ভক্তির কারণে খুব ভয় পেতে শুরু করবে। ঠিক তেমনি অবস্থা হল পরিচিত আর অপরিচিতের মাঝে।

নবীদের পরে 'খোদাভীতি' সবচেয়ে বেশী ছিল সাহাবায়ে কেরামের। কারণ সাধারণ মানুষের চেয়ে খোদার পরিচয় তাদের বেশী ছিল। তাই তারা আল্লাহকে ভয়ও বেশী করতেন।

হযরত হানযালা (রাযিঃ)-এর খোদাভীতি

একদিন হযরত হানযালা (রাযিঃ) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'হানযালা তো মোনাফেক হয়ে গেছে'। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন,

তা কিভাবে? তখন হযরত হানযালা (রাযিঃ) বললেন, হুযূর! যখন আপনার মজলিসে বসি, জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনি, আখেরাতের অবস্থা শুনি তখন অন্তর বিগলিত হয়ে পড়ে, দুনিয়া থেকে বিমুখতা সৃষ্টি হয়, আখেরাতের কথা চিন্তায় আসে কিন্তু যখন ঘরে ফিরে যাই, বিবি-বাচ্চাদের সাথে মেলা-মেশা করি এবং দুনিয়াবী কাজ-কর্মে লিপ্ত হই তখন আর অন্তরের সে অবস্থা বাকী থাকে না। বরং দুনিয়ার মুহাব্বত আমার অন্তরে ছেয়ে যায়। সুতরাং এখানে আসলে এক অবস্থা। আর বাইরে গেলে আরেক অবস্থা, এটাইতো মুনাফেকের নিদর্শন। উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

ياحنظلة ساعة ساعة

অর্থাৎ, হে হানযালা! ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটা শুধু সময় সময়ের। কখনও অন্তরে নম্রতা বেশী হবে, আবার কখনও কম হবে। আল্লাহর দরবারে এর কোন ধর্তব্য নেই। বরং আসল ভীত্তি হচ্ছে আমলের উপর। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, কোন কাজ শরীঅতের পরিপন্থী হচ্ছে কি না?

হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খোদাভীতি

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ফারূকে আযম (রাযিঃ) নিজ কানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঘোষণা শুনেছেন যে, 'উমর জান্নাতী এবং এ ঘটনাটিও শুনেছেন যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যখন মেরাজে গিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে জান্নাত ভ্রমণ করে দেখছিলাম। তখন আমি জান্নাতে একটি চমৎকার উঁচু দালান দেখতে পেলাম এবং সে দালানের পাশে একটি মেয়েকে বসে উযূ করতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এত সুন্দর এ দালানটি কার জন্য? আমাকে বলা হল যে, এটি উমর (রাযিঃ)-এর জন্য। ঐ দালানটি এতই চমৎকার ছিল যে, আমার মন চাইল, আমি এতে প্রবেশ করি। কিন্তু উমর! তোমার আত্মমর্যাদা বোধের কথা আমার স্মরণ হলো তাই আমি সেখানে প্রবেশ না করে ফিরে এসেছি। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) কেঁদে দিয়ে

বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর কি আমার আত্মমর্যাদাবোধ চলে?

হযরত উমর (রাযিঃ) স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যবান মোবারক থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন এবং জান্নাতে নিজের সুউচ্চ বাসস্থানের কথাও শুনেছেন। এতকিছু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা এমন ছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর তিনি হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ) (যার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মুনাফেকদের নাম বলে দিয়েছিলেন যে, মদীনার অমুক অমুক মুনাফেক)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে হুযায়ফা! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলে দাও, আমার নাম কি মুনাফেকের লিষ্টে আছে? এবং তিনি ভাবতেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু কোন সময় হয়ত আমার পক্ষ থেকে এমন কোন বদ আমলও হয়ে যেতে পারে যা, আমার সে মান-মর্যাদাকে বিনষ্ট করে দিবে।

দেখুন, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর মত সাহাবীর এমন চিন্তা আসতো।

সারকথা যার যত বেশী আল্লাহর পরিচয় থাকবে, তার ভিতরে তত বেশী আল্লাহর ভয় থাকবে। আর এ ভয় যতক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত 'তাকওয়া'ও অর্জিত হবে না।

খোদাভীতি সৃষ্টি করার পদ্ধতি

এ খোদাভীতি সৃষ্টি করার পদ্ধতি হল যে, চব্বিশ ঘন্টার যে কোন সময়, ফযরের পরে বা রাতে শোয়ার পূর্বে একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিবেন। সে সময়টিতে ধ্যান করবেন যে, আমি এখন মৃত্যুবরণ করছি, আমি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। আত্মীয়-স্বজন আমার আশে-পাশে বসে আছে। এখনই আমার জান বের হয়ে যাবে। এরপর আমাকে কাফনের কাপড় পরিধান করানো হবে। এরপর আমাকে দাফন করা হবে। এরপর ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করার জন্য আসবেন, আমি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হচ্ছি। এভাবে ধ্যান করবেন।

মানুষ যখন প্রতি দিন একথাগুলো চিন্তা করবে, তখন অন্তর থেকে ধীরে ধীরে উদাসীনতার পর্দা উঠে যাবে ইনশাআল্লাহ। আজ উদাসীনতার পর্দা আমাদের উপর এজন্যই পড়েছে যে, আমরা মৃত্যুর কথা ভুলে গেছি। আমরা নিজ হাতে আত্মীয়-স্বজনদের দাফন করে আসছি। তাদের জানাযা নিজ কাঁধে বহন করছি। নিজ চোখে দেখছি অমুক ব্যক্তি দেখতে দেখতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি যে, যারা দুনিয়া অর্জন করার জন্য পাগলের ন্যায় রোদ-বৃষ্টিতে মেহমত করে যাচ্ছে তারা দুনিয়া থেকে খালি হাতেই বিদায় নিচ্ছে এবং একটি বারের জন্যও এ দুনিয়ার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। এ সমস্ত বস্তু দেখার পরেও আমরা বুঝি না নিজের ব্যাপারে একটুও চিন্তা আসে না যে, আমাকেও একদিন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

اكثروا ذكرهاذم اللذات الموت

অর্থাৎ, ঐ বস্তুকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যা সব ধরনের স্বাধকে নিঃশেষ করে দিবে। আর সেটি হল 'মউত'। একে কখনও ভুলো না। বরং বেশী বেশী স্মরণ কর।

সারকথা সকাল অথবা সন্ধ্যার সময় উল্লেখিত বিষয় সমূহের কিছু কিছু করে মুরাকাবাহ করুন। তবে কিছু না কিছু ভয় অবশ্যই অন্তরে সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

আমলের উপর অহংকার করো না

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতী ব্যক্তিদের ন্যায় আমল করতে থাকে। শুধু তাই নয় বরং সে আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার মাঝে আর জান্নাতের মাঝে শুধু এক হাতের ব্যবধান থাকে। তার উপর ভাগ্যের লেখা প্রবল হয়ে যায়। তখন সে জাহান্নামীদের মত বদ আমল করতে শুরু করে। এমনকি বদ আমল করতে করতে সে অবশেষে

জাহান্নামেরই অধিবাসী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কখনও কখনও এর বিপরীত দেখা যায় যে, কোন মানুষ জাহান্নামীদের ন্যায় বদ আমল করতে থাকে। এমনকি বদ আমলের এমন চরম পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার মাঝে আর জাহান্নামের মাঝে শুধু এক হাতের ব্যবধান থাকে। অতঃপর হঠাৎ তার উপর তাকদীরের লেখা প্রবল হয় তখন সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে শুরু করে। অতঃপর সে আমল করতে করতে জান্নাতবাসীদের মধ্যে শামীল হয়ে যায়।

এ হাদীস থেকে এ সবক পাওয়া যায় যে, কারো জন্যই নিজ আমলের উপর বড়াই দেখানো উচিত নয় যে, আমি অমুক অমুক আমল করেছি। কারণ এ সমস্ত আমলের কোন ধর্তব্য নেই। ধর্তব্য শুধু শেষ জীবনের আমলেরই হবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছেঃ

انما العبرة بالخواتيم

অর্থাৎঃ শুধু শেষ আমলই ধর্তব্য হবে। দেখা হবে যে, শেষ পর্যায়ের আমলটি কেমন। এমন যেন না হয় যে, কোন বদ আমলের দরুণ জাহান্নামে যেতে হয়। তাই আমল করার সময় ভয়ও রাখতে হবে। কিন্তু একথাটি স্পষ্টভাবে বুঝে নিন যে, জান্নাতী ব্যক্তি হতে জাহান্নামীদের আমল জোরপূর্বক করানো হয় না। বরং সে তা নিজ ইচ্ছায় করে। তাকে কোনভাবে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু সে গোনাহের কু-প্রভাব এতই মারাত্মক যে, সেটি পিছনের জীবনের সমস্ত নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয় এবং মানুষকে অপকর্মের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কোন কোন গোনাহের প্রতিক্রিয়া এত মারাত্মক যে, সে দ্বিতীয় আরেকটি গোনাহের দিকে ডেকে নিয়ে যায়। আবার সে দ্বিতীয়টি ডেকে নেয় তৃতীয়টির দিকে। এভাবে তাকে ধীরে ধীরে গোনাহের সাগরে ডুবিয়ে দেয়। যার প্রেক্ষিতে পিছনের জীবনের সমস্ত আমল নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই বুযুর্গগণ বলে থাকেন যে, কোন গোনাহকেই ছোট মনে করে এতে জড়িত হতে যেও না। কারণ হতে পারে এ ক্ষুদ্র গোনাহটিই তোমার পুরো জীবনের নেক আমলসমূহকে বিনষ্ট করে দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর কোন গোনাহকে ছোট মনে করে করলে সেটি কবীরায় গণ্য হবে।

বে-আদবী থেকে বেঁচে থাকতে হবে

কোন বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে বে-আদবী করা, তাদেরকে উপহাস করা, তাদেরকে কষ্ট দেয়া এমন মারাত্মক যে এর ফলে অনেক সময় নিজের ঈমান-আকীদা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। তাই আপনার সাথে যদি কোন আল্লাহওয়ালার মতানৈক্য হয়, তখন সে মতানৈক্যকে মতানৈক্যর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন। কিন্তু যদি আপনি তার শানে বে-আদবী শুরু করেন, তবে মনে রাখবেন এর ফলে মানুষ এমন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, যা থেকে রেহাই পাওয়া তার জন্য বড়ই দুষ্কর হয়ে পড়ে।

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) 'দরসে ইবরত' নামে একখানা বই লিখেছেন। যাতে তিনি একজন বুযুর্গের উপদেশমূলক একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যিনি পুরো জীবন শায়খ ও আল্লাহওয়ালা ছিলেন। হঠাৎ তার আকীদা পাল্টে গিয়েছিলো এবং তিনি গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

তাই বলি অনেক ছোট গোনাহের দ্বারাও বড় বড় ক্ষতি হয়ে যায়। এজন্য কোন গোনাহকে ছোট মনে করে তাতে লিপ্ত না হওয়া চাই। পক্ষান্তরে কোন কোন সময় এর উল্টোও হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তির আমল খুবই খারাপ। গোনাহে লিপ্ত। হঠাৎ আল্লাহতা'আলা তাকে নেক আমলের সুযোগ দিয়ে দেন। আর এটাও কোন নেক আমলের বদৌলতেই হয়ে থাকে। যেমন, পূর্বে কোন ছোট নেক আমল করেছিলো। এখন তার বরকতে আল্লাহতা'আলা আরো নেক আমল করার তাওফীক দিয়ে দেন। যার ফলে তাঁর জান্নাতের রাস্তা সুগম হয়। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

لايحقرن احد من المعروف شيئا

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেন কোন নেক আমলকে ছোট ও তুচ্ছ মনে না করে। বলা তো যায় না, হয়ত এ সামান্য নেক আমলই তোমার জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিবে এবং এর দ্বারাই তুমি আখেরাতে পার পেয়ে

যাবে। এর উসিলায় আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। অনেক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের জীবনের অসংখ্য ঘটনা এমন আছে যে, আল্লাহতা'আলা ক্ষুদ্র আমলকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনের মোড় পাল্টে দিয়েছেন। তাই ছোট কোন নেক আমলকে তুচ্ছ ও হালকা মনে করতে নেই। আর আমি 'সহজ আমল নেকী বেশী' নামে একখানা ছোট গ্রন্থ লিখেছি। যার ভেতর এমন ছোট ছোট নেক আমলের কথা লিখে দেয়া হয়েছে, যেগুলোর বহু ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মানুষ যদি এ নেক কাজগুলো করে নেয়, তবে স্বল্প পুঁজিতে প্রচুর লাভ করতে সক্ষম হবে। সব মুসলমানেরই সে গ্রন্থটি পাঠ করা উচিত। এই কিতাবে বর্ণিত আমলসমূহ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা বাঞ্ছনীয়।

তাকদীরের অর্থ

কেউ কেউ এ হাদীসের ভিত্তিতে বলে থাকেন যে, যেহেতু তাকদীরেই লেখা আছে যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী, অমুক ব্যক্তি জাহান্নামী। তবে আর আমল করার কি প্রয়োজন? যা তাকদীরে আছে তা-ই হবে।

খুব ভাল করে বুঝে নিন, এ হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, তোমরা ঐ আমলই করবে যা তাকদীরে লিখা আছে। বরং হাদীসের অর্থ হচ্ছে যে, তাকদীরে ঐ বস্তুই লিখা আছে যা তোমরা স্বেচ্ছায় করবে। কারণ তাকদীর বলা হয় হল ইলমে এলাহীর নাম। আর আল্লাহ পূর্ব থেকেই জানতেন যে, তোমরা স্বেচ্ছায় কি কি কাজ করবে। তাই সবকিছু আল্লাহতা'আলা লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। মনে রাখতে হবে, তোমাদের জান্নাতে যাওয়া, জাহান্নামে যাওয়া তোমাদের ইচ্ছাধীন কাজের উপরেই।

সুতরাং একথা নয় যে, মানুষ ঐ আমলই করে যা তার আমলনামায় লিখা আছে। বরং তাকদীরে ঐ বস্তুই লিখা আছে যা মানুষ নিজ ইচ্ছায় করে থাকে। আল্লাহতা'আলা প্রত্যেক মানুষকেই ভুল ও সঠিকের মাঝে ব্যবধান করার বুঝ শক্তি দান করেছেন। ইখতেয়ার দিয়েছেন। আর মানুষ সে বুঝ শক্তি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। তাই এখন একথা বলে হাতের উপর হাত রেখে বসে যাওয়া ঠিক হবে না যে, তাকদীরে তো সবকিছু লিখাই আছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উল্লেখিত হাদীসখানা এরশাদ করেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেছিলেনঃ

ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ, হে আল্লাহর রাসূল! যখন ফায়সালা হয়েই গেছে যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী, অমুক ব্যক্তি জাহান্নামী, তবে আবার আমল করার কি প্রয়োজন? উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اعملوا فكل ميسر لما خلق له

অর্থাৎ, তোমরা আমল করতে থাক। কারণ প্রত্যেকের সে আমলই করতে হবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব তোমরা তোমাদের বুঝ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমল করতে থাক।

এ হাদীসখানা এখানে উল্লেখ করার কারণ হল, মানুষ যেন এ চিন্তা না করে যে, আমি তো লম্বা লম্বা ওযীফা-তাসবীহ পাঠ করছি। নফল পড়ছি। পূর্ণ শরীঅতের উপর কায়েম আছি। সুতরাং এখন চিন্তাহীনভাবে বসে যাই। আরে মানুষ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্থির হতে পারে না। সর্বদা এ চিন্তা করতে হয়, হায়! যেন কখনও আমার এই নেক অবস্থা পরিবর্তন না হয়ে যায়। মাওলানা রূমী (রহঃ) ইরশাদ করেনঃ

اندریں راہ می تراش ومی خراش - تادم آخر دمے فارغ مباش

অর্থাৎ, এ পথে তুমি তোমার মনজিলে মাকসাদকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অবিরাম গতিতে চলতেই থাক। সদা-সর্বদা নিজের নফসের নেগরানী অব্যাহত রাখ, যেন কখনও সে ভুল পথের দিকে পা বাড়াতে না পারে। অনেক বড় বড় আল্লাহওয়ালা চিন্তাহীন হওয়ার দরুন হোচট খেয়েছেন। তাই শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বে-ফিকির হওয়া উচিত নয়।

জাহন্নামের সর্বনিম্ন শাস্তি

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহান্নামের সর্বনিম্ন যে শাস্তি হবে তাহল পায়ের নিচে দুটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ রেখে দেয়া হবে। কিন্তু এর তাপ এত মারাত্মক বেশী হবে যে, মনে হবে

যেন মাথার মগজ বিগলিত হয়ে পড়ছে। আর সে ব্যক্তি মনে করবে যে, সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তারই হচ্ছে। অথচ তাকে সর্বনিম্ন শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, এ শাস্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেবকে দেয়া হবে। কারণ তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু তিনি শেষ সময় পর্যন্ত ঈমান আনেননি তাই তার এ শাস্তি হবে।

সারকথা এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যখন সর্বনিম্ন শাস্তির কারণে এ অবস্থা হবে। তবে যাদের ব্যাপারে কঠিন শাস্তির সংবাদ দেয়া হয়েছে তাদের কি অবস্থা হবে? যদি জাহান্নামের এ শাস্তির কথা মানুষ স্মরণ করে, তবে এর ফলে মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে এবং তাকওয়া অর্জিত হবে।

জাহান্নামীদের শ্রেণী বিভাগ

এক হাদীসে জাহান্নামীদের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা এসেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কোন কোন জাহান্নামীর অবস্থা এমন হবে যে আগুন তার টাখনু পর্যন্ত পৌছে যাবে। পায়ের তালুতে আগুন রাখলে কেমন অবস্থা হবে তার বর্ণনাতো আপনারা শুনেছেন। তাহলে ভেবে দেখুন, যার টাখনু পর্যন্ত আগুন হবে তার অবস্থাটা কি হবে? আবার কেউ কেউ এমনও হবে যার হাটু পর্যন্ত আগুনে গ্রাস করে নিবে। আবার কারো কারো কোমর পর্যন্ত। কারো গলার নিচের হাড়ি পর্যন্ত। এই হল জাহান্নামীদের শাস্তির বিভিন্ন স্তর। আল্লাহতা'আলা স্বীয় মেহেরবাণী দ্বারা আমাদের হিফাজত করুন। আমীন।

হাশরের মাঠের অবস্থা

জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়ার পূর্বে যে কঠিন একটি স্থানে অবস্থান করতে হবে তার নাম হচ্ছে হাশরের মাঠ। সেখানের অবস্থা কেমন হবে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মানুষ মহান আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে এ অবস্থায় কেউ কান পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত থাকবে। প্রচন্ড গরমের কারণে এ ঘাম বের হবে।

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মানুষের এত ঘাম বের হবে যে, তা সত্তুর গজ জমিন

দিয়ে বয়ে যাবে এবং সে ঘাম মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ডুবিয়ে দিবে। ধীরে ধীরে তা কান পর্যন্ত পৌছে যাবে।

জাহান্নামের প্রশস্ততা

এক হাদীসে এসেছে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) ইরশাদ করেন, আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তিনি কোন বস্তু উপর থেকে নিচে পতিত হওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন। সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কি বলতে পার কোন বস্তু পতিত হওয়ার আওয়াজ হল? আমরা বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আজ থেকে সত্তুর বৎসর পূর্বে জাহান্নামে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আজ সে পাথর নিচে গিয়ে পৌছেছে। এ আওয়াজটি সে পাথরেরই পতিত হওয়ার আওয়াজ।

আগে মানুষ মনে করত এটা কেমন করে সম্ভব। হয়ত কিছু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। আসলে বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন তো আধুনিক যুগে বিজ্ঞান সেটাকে বুঝার অবস্থা সহজ করে দিয়েছে। আজ বিজ্ঞান বলে যে, অনেক তারকা এমনও রয়েছে যার আলোকরশ্মি সৃষ্টিলগ্ন থেকে পৃথিবীর দিকে আসছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে আলোকরশ্মি পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌছেনি। যখন আল্লাহতা'আলার সৃষ্টিজগৎ এত প্রশস্ত। তাহলে এতে অসম্ভবের কি আছে যে, একটি পাথর সত্তুর বৎসর পর্যন্ত গড়াতে গড়াতে গিয়ে জাহান্নামের তলদেশে পৌছেছে।

আসল কথা হল, এ হাদীস দ্বারা জাহান্নামের প্রশস্ততা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহতা'আলা আমাদের বুঝ দান করুন। উল্লেখিত হাদীসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে, মানুষ যেন কখনও কখনও নিজের মৃত্যু, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে অন্তর বিগলিত হবে এবং আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে। ফলে মানুষের জন্য গোনাহ পরিহার করা এবং নেক কাজ করা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহতা'আলা আমাদের সবার অন্তরে তার ভয় সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من عير اخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের কোন মুসলমান ভাইকে এমন কোন গোনাহের জন্য লজ্জা দিবে, তাকে তিরস্কার করবে, যে গোনাহ থেকে সে তাওবা করেছে। তবে এ তিরস্কারকারী ব্যক্তির ঐ সময় পর্যন্ত মৃত আসবে না যতক্ষণ না সে ঐ গোনাহে নিজেও লিপ্ত হয়। (তিরমিযী শরীফ)

ব্যাখ্যাঃ অন্যকে লজ্জা দেয়ার অর্থ হল, যেমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি জানেন যে, সে অমুক গোনাহের মধ্যে লিপ্ত ছিল। আবার এটাও জানেন যে, সে এ গোনাহ থেকে তাওবাও করে নিয়েছে। পূর্বে কৃত গোনাহের জন্য তাকে লজ্জা দেয়া, তুচ্ছ মনে করা, তিরস্কার করা যে, তুমি তো ঐ ব্যক্তি যে অমুক অমুক অপকর্ম করেছিলে। এ ধরনের তিরস্কার করা মারাত্মক অপরাধ। কারণ সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নিয়েছে। আর তাওবা দ্বারা তার গোনাহ শুধু মাফই হয়নি

বরং তার আমলনামা থেকেও এ গোনাহের চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহতা'আলা তাকে পাক-সাফ করে সম্মানিত করেছেন কিন্তু তুমি তাকে গোনাহের কারণে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করছো। তাকে ভর্ৎসনা দিচ্ছ। তিরস্কার করছো। তোমার এ কাজ আল্লাহর নিকট খুবই নিন্দনীয় অপরাধ।

গোনাহগার রোগীর ন্যায়

উল্লেখিত নিয়ম ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যার ব্যাপারে আপনি জানেন যে, সে তাওবা করে নিয়েছে। আর যদি আপনি না জানেন যে, সে তাওবা করেছে কি না, তবে একজন মুমিনের ব্যাপারে এ ধারণা রাখাই বাঞ্ছনীয় যে, সে ব্যক্তি তাওবা করে নিয়েছে বা সামনে তাওবা করে নিবে। কারণ শরীঅতের হুকুম হল, আপনি যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন যে, সে গোনাহ করেছে। কিন্তু একথা জানেন না যে, সে তাওবা করেছে কিনা! এ অবস্থায় আপনার কোন হক নেই যে, আপনি তাকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করবেন।

মনে রাখবেন গোনাহকে ঘৃণা করা যায়। গোনাহগারকে নয়। গোনাহগার বা নাফরমানীকে ঘৃণা করার শিক্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেননি। বরং সে গোনাহগারতো সহানুভূতি ও সমবেদনা পাওয়ার যোগ্য। কারণ এ বেচারা এক ধরনের রোগে আক্রান্ত। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে কি সে ঘৃণার পাত্র হয়ে যায়? বাস্তব কথা তো এটাই যে, রোগী ব্যক্তি ঘৃণার যোগ্য হয় না। বরং সে রোগই ঘৃণার যোগ্য। তাই রোগীর রোগ দূর করার চেষ্টা করুন। তার জন্য চিন্তা করুন, দু'আ করুন।

এমনকি কাফেরের কুফরকে ঘৃণা করুন। সে ব্যক্তিকে নয়। বরং তার জন্য দু'আ করুন, হে আল্লাহ! একে হেদায়েত দান করুন। দেখুন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের পক্ষ থেকে কত নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তার উপর তীর বর্ষন করা হয়েছে, পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তার শরীরকে রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে। এ করুণ মুহূর্তেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ

اللهم اهدى قومى فانهم لايعلمون

অর্থাৎ, হে প্রভু! আমার এ জাতিকে হেদায়েত দিয়ে দাও, তারা বাস্তবে আমার এবং আমার দ্বীন সম্পর্কে জানে না।

দেখুন, তারা অন্যায়, অনাচার, কুফর, শিরক ও জুলুম-নির্যাতনের চরম পর্যায়ে পৌছার পরেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে ঘৃণার প্রকাশ ঘটাননি। বরং দয়া ও মেহেরবাণী দেখিয়েছেন এবং বলেছেন হে প্রভু! এরা অজ্ঞ। এরা বাস্তব জিনিসটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তাই তারা আমার সাথে এ ধরনের অনাচার করেছে। আল্লাহ! আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন। তাদের হেদায়েত দিয়ে দিন। তাই যখন কোন ব্যক্তিকে কোন গোনাহে লিপ্ত দেখবেন, তার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করবেন এবং দু'আ করবেন যেন সে এ গোনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারে। তাকে তাবলীগ এবং দাওয়াতের মাধ্যমে বুঝাবেন। তাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করবেন না। বলা তো যায় না, হয়ত আল্লাহতা'আলা তাকে তাওবার তাওফীক দিয়ে দিবেন। অতঃপর সে আপনার চেয়ে অনেক উপরে উঠে যাবে।

হযরত থানভী (রহঃ) অন্যকে নিজের চাইতে বড় মনে করতেন

হাকীমুল উম্মত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর এ উক্তিটি আমি আমার পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) এবং আমার শায়খ হযরত ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, 'আমি বর্তমান কালের দিকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক মুসলমান এবং ভবিষ্যত কালের দিকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক কাফেরকে আমার চেয়ে উত্তম মনে করি। ভবিষ্যত কালের অর্থ হল যে, যদিও সে এখন কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত। বলা তো যায় না হয়ত আল্লাহতা'আলা তাকে তাওবার তাওফীক দিয়ে দিবেন এবং সে এক সময় খোদাদ্রোহীতার ঘোর অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে ঈমানের উজ্জ্বল আলোকে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বর্তমানে মুসলমান, ঈমানের অধিকারী। যাকে আল্লাহতা'আলা ঈমানের নূরে আলোকিত করেছেন। বলা তো যায়

না, হয়ত কখনও সে এ দৌলত হারাতেও পারে। কারণ প্রত্যেক মানুষেরই আল্লাহর সাথে স্বীয় একটি অবস্থা হয়ে থাকে, যা অন্য কেউ জানে না। তাই অন্যের ব্যাপারে আমি কিভাবে বলবো যে, সে ভাল বা মন্দ। তাই আমি প্রত্যেক মুসলমানকে আমার চেয়ে উত্তম মনে করি এবং একথাও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আমার এ কথার মধ্যে কোন লৌকিকতা নেই যে, 'আমি অন্যকে আমার চেয়ে বড় মনে করি' এ বাক্যটি আমি আমার সৎ চরিত্রের প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেছি, এমনটি নয়। বরং আমি বাস্তবেই অন্যকে আমার চেয়ে উত্তম মনে করি আর কাউকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা জায়েয নেই। চাই সে যত বড় গোনাহগারই হোক না কেন।

নিজেদের কারা বড় মনে করে?

নিজেকে বড় মনে করা আর অন্যকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা এই ব্যাধিটি বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়, যারা হঠাৎ করে দ্বীনদার হয় অর্থাৎ প্রথম প্রথম তাদের অবস্থা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ছিল না। পরে তারা ইসলামের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং নামায, রোযার পাবন্দ হয়ে গেছে। চেহারা-সুরত এবং লেবাস-পোষাক ইসলাম মোয়াফেক বানিয়ে নিয়েছে। মসজিদে আসতে এবং জামাতের সাথে নামায পড়তে শুরু করেছে। তাদের অন্তরে শয়তান একথা ঢেলে দিয়েছে যে, তুমিই বর্তমানে সঠিক রাস্তার উপর আছ। বাকি সমস্ত সৃষ্টিজগত যারা গোনাহে লিপ্ত তারা সকলেই ধ্বংসের পথে আছে। তাই তারা নিজেদের বড় এবং অন্যদের ছোট ও তুচ্ছ মনে করে থাকে এবং অন্যদেরকে হেয় নজরে দেখে। অহংকারের ভাব নিয়ে অন্যদের সমালোচনা করতে থাকে। এভাবে শয়তান তাদেরকে গর্ব, অহংকার, আত্মগৌরব ও খোদ পছন্দীর জালে আবদ্ধ করে দেয়। আর যখন মানুষের মধ্যে এ সকল আধ্যাত্মিক রোগ জায়গা করে নেয়, তখন এর কুফলে সমস্ত আমল সমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ মানুষ যখন নিজেকে বড় এবং অন্যকে ছোট মনে করতে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর অহংকার মানুষের আমলসমূহকে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দেয়। কারণ আল্লাহর দরবারে কেবলমাত্র ঐ আমলই গ্রহণযোগ্য হবে, যা ইখলাসের সাথে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য করা হয়। আর যদি ইবাদত করে

অহংকার প্রকাশ করা হয়, তাহলে তা কবুল হবে না। কারণ আল্লাহ পাকের দরবারে কেবলমাত্র সেই আমলই কবুল হয় যে আমলের পরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা হয় এবং একথা বলা হয় যে, আল্লাহতা'আলা আমাকে এ কাজ করার তাওফীক দান করেছেন। সুতরাং কোন মুসলমানকে হেয়প্রতিপন্ন করা, এমনকি কোন কাফের বা ফাসেককেও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।

বিপদাপন্ন বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে বা বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে দেখে তার নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা উচিতঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ - وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ঐ রোগ/বিপদ থেকে মুক্ত রেখেছেন, যাতে তোমাকে আক্রান্ত করেছেন এবং তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টিজগতের অনেক লোকের উপর আমাকে সম্মানিত করেছেন। (তিরমিযী শরীফ)

ব্যাখ্যাঃ এ দুনিয়ায় অনেক মানুষ আছে যারা খুব জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত। কিন্তু আপনি দয়া করে আমাকে সুস্থ রেখেছেন।

কোন রুগীকে দেখলে এ দু'আ পড়া সুন্নাত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তাগিদও করেছেন। আমাদের শায়খ ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ) বলতেন, আমি যখন কোন হাসপাতালের নিকট দিয়ে যাই তখন এ দু'আ পড়ে নেই এবং সাথে সাথে এও বলি, হে আল্লাহ! এ সকল রোগীকে সুস্থ করে দাও।

আমাদের এক উস্তাদ বলতেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন রোগীকে দেখলে এ দু'আ পড়ার জন্য বলেছেন, তাই আমি যখন কোন ব্যক্তিকে কোন গোনাহ বা নাফরমানীর মধ্যে লিপ্ত দেখি তখনও এ দু'আ পড়ি। কারণ গোনাহগার ব্যক্তিও একজন রোগীর ন্যায়। যেমন, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় যদি দেখি যে, লোকেরা সিনেমা দেখছে বা তার

টিকেট ক্রয় করছে বা তার জন্য লাইনে দাড়িয়ে আছে, তখন এদের দেখেও এ দু'আ পড়ে নেই এবং আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি আমাকে এ পাপ থেকে মুক্ত রেখেছেন। আর আমার এ দু'আ পড়ার কারণ হল যে, রোগী ব্যক্তি যেমনিভাবে সমবেদনা ও দু'আ ও দয়া পাওয়ার যোগ্য, ঠিক তেমনিভাবে এ গোনাহগার ব্যক্তিও সমবেদনা ও দু'আ পাওয়ার যোগ্য। কারণ সে এ মুসীবতে জর্জরিত। তাই তার জন্য দু'আ করা উচিত। হে আল্লাহ! তুমি একে এ রোগ থেকে মুক্তি দিয়ে দাও।

এমনটি হওয়া তো অসম্ভব কিছু নয় যে, আজ যারা গোনাহগারের সারিতে দাড়িয়ে আছে। আর আপনি তাদের তুচ্ছ মনে করছেন, হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাওবার তাওফীক দিবেন। তখন তারা তাওবা করে আপনার উপরে চলে যাবে। তাই কিসের ভিত্তিতে আপনি অহংকার দেখাবেন? যখন আল্লাহতা'আলা আপনাকে গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দিয়েছেন তার জন্য তার দরবারে শুকরিয়া আদায় করুন। আর তাদের জন্য দু'আ করুন যে, হে প্রভু! আপনি এদের হেদায়েত দিয়ে দিন।

সারকথাঃ কাফেরের কুফরী, গোনাহগারের গোনাহকে ঘৃণা করবেন। কাফের ও গোনাহগারকে ঘৃণা করবেন না। বরং তাদেরকে মায়া-মমতা ও নরম ব্যবহার করে মহব্বতের সাথে বুঝাবেন। তবেই তাদের অন্তরে আপনার কথার প্রতিক্রিয়া হবে। আর এটাই ছিল আমাদের সকল বুযুর্গের তরীকা।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী ও চোর

আমি আমার সম্মানিত পিতা, হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)-এর নিকট থেকে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-এর ঘটনা শুনেছি। ঘটনাটি হল, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) একদিন এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন যে, রাস্তার পাশে এক ব্যক্তিকে শুলে চড়ানো। আর তার এক হাত এবং এক পা কাটা। তিনি স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, কি ব্যাপার তাকে কেন শুলিতে চড়ানো হলো? উত্তরে লোকেরা বলল, এ ব্যক্তি চুরিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলো। যখন প্রথম বার সে ধরা পড়েছে, তখন তার হাত কেটে দেয়া হয়েছে। আর যখন দ্বিতীয় বার ধরা পড়েছে তখন তার পা কেটে দেয়া হয়েছে। এবার যখন তৃতীয় বার আবার ধরা পড়েছে তখন তাকে শুলিতে চড়ানো হয়েছে।

সব কথা শোনার পর হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) আগে বাড়লেন এবং তার পা ধরে চুমু খেলেন। এ অবস্থা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। হযরত! সে একজন স্বভাবগত চোর। কিন্তু এ সত্ত্বেও আপনি তার পা চুম্বন করলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, সে যদিও একজন বড় অন্যায়কারী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার ভিতরে একটি উত্তম গুণ রয়েছে। সেটা হল তার দৃঢ়তা। যদিও সে এটিকে ভুল পথে ব্যবহার করেছে। কারণ এমন একটি কাজকে সে অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছিল, যার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে, হাত ও পা হারাতে হয়েছে। শুধু তাই নয় বরং তাকে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও সে তার এ কাজকে পরিত্যাগ করেনি। বরং সে এ কাজ বরাবর করেই যাচ্ছিলো। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তার ভিতরে 'দৃঢ়তা' ছিল সম্পূর্ণরূপে। আর তার 'দৃঢ়তা' নামক গুণটির কারণেই আমি তার পায়ে চুমু খেয়েছি।

চিন্তা করে দেখুন, বাস্তবে যারা আল্লাহওয়ালা তারা সর্বদা মানুষের ভালোর দিকে লক্ষ্য করে মানুষকে ভালবাসেন। চাই সে মানুষটি অন্যান্য দিক দিয়ে যত অন্যায়কারী হোক এবং তারা বলেন, যদি কোন মানুষের ভিতরে ভাল কোন গুণ থাকে তবে সেটা গ্রহণযোগ্য। আর তার ভিতরে যদি কোন মন্দ স্বভাব থাকে, তবে তা দূরীভূত করার চিন্তা-ভাবনা করবেন। তাকে মহব্বতের সাথে বুঝাবেন। তার দোষ-ত্রুটি শুধু তার কাছেই গিয়ে বলবেন। তার মন্দ স্বভাবগুলো অন্যদের নিকট বলে বেড়াবেন না।

এক মুমিন অন্য মুমিনের আয়না স্বরূপ

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

المؤمن مرأة المؤمن

অর্থাৎ, একজন মুমিন, অন্য মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ।

ব্যাখ্যাঃ যদি মানুষের চেহারায় কোন দাগ লাগে, আর সে ব্যক্তি গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, তবে আয়না তাকে বলে দেবে যে, তোমার চেহারায় দাগ লেগে আছে। ঠিক তেমনিভাবে একজন মুমিনও অন্য মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ। তাই একজন মুমিন যখন অপর একজন

মুমিনের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি দেখবে, তখন তার জন্য উচিত যে, তাকে মহব্বতের সাথে বলে দিবে, হে ভাই! তোমার মধ্যে এ দোষটি আছে। যেমন, আপনি দেখলেন যে, একজনের শরীরে জোঁক বা বিষাক্ত ধরনের কোন জন্তু লেগে আছে। তখন মহব্বতের দাবী তো এটাই যে, আপনি তাকে বলে দিবেন, দেখ! ভাই তোমার শরীরে জোঁক বা বিষাক্ত বস্তু লেগে আছে। সেটাকে দূর করে নাও। তেমনিভাবে যদি কোন মুসলমান ভাইয়ের ভিতরে দুনিয়াবী বা দ্বীনী ব্যাপারে কোন ত্রুটি দেখা যায়, তাহলে তাকে মহব্বতের সাথে বলে দিতে হবে যে, হে ভাই! তোমার ভিতরে অমুক দোষটি আছে, তুমি এর সংশোধন করে নাও।

পরনিন্দা করবেন না

হাকীমুল উম্মত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাবেন, তখন শুধু তাকেই গিয়ে বলবেন যে, ভাই! আপনার মধ্যে অমুক দোষ আছে। অন্য কারো কাছে বলতে যাবেন না যে, অমুকের ভিতরে অমুক দোষ-ত্রুটি আছে। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনকে আয়নার সাথে উপমা দিয়েছেন। আর আয়না শুধু ঐ ব্যক্তির নিকটেই চেহারার দাগের কথা বলে যে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এই আয়না অন্য কারো নিকট বলতে যায় না যে, অমুক ব্যক্তির চেহারায় দাগ আছে। তাই মুমিনের জন্যও উচিত যে, যার ভিতরে কোন দোষ-ত্রুটি দেখবে শুধু তাকেই গিয়ে বলবে। অন্য কারো কাছে এ খবর বলতে যাবে না। আর যদি অন্যের নিকট বলে দেন, তার অর্থ এই হবে যে, আপনি এ কাজ স্বার্থহীনভাবে করেননি বরং এতে আপনার স্বার্থ জড়িত আছে। কাজেই এটা দ্বীনের কোন কাজ হিসেবে গণ্য হবে না। আর যদি খুব গোপনে মহব্বতের সাথে শুধু তাকেই তার দোষ সম্পর্কে অবহিত করেন। তবে সেটিই হল ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানের দাবী। কিন্তু তাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা কখনও জায়েয হবে না।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝে-শুনে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

গোনাহের স্বাধ একটি ধোঁকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حجبت النار بالشهوات - وحجبت الجنة بالمكاره

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহান্নামকে খায়েশাতে নফ্সানী তথা কু-প্রবৃত্তির চাহিদার পর্দা দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে দেয়া হয়েছে এমন বস্তু দ্বারা, যেগুলোকে মানুষ দুনিয়াতে বহু কষ্টকর ও অসাধ্য মনে করে এবং অপছন্দ করে।

ব্যাখ্যাঃ এ দুনিয়াটাকে আল্লাহতা'আলা পরীক্ষার স্থান হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। এ পরীক্ষার দাবী হল, বান্দা স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে এতে সাফল্য অর্জন করবে। যদি বান্দার সামনে জাহান্নামকে পেশ করে দিয়ে বলা হত, এই দেখ! 'জাহান্নাম' এতে কেমন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তবে সে ব্যক্তি জাহান্নাম দেখে ফেলত। এমনিভাবে যদি বান্দার সম্মুখে জান্নাতকে উপস্থিত করে দেয়া হত, তবে জান্নাতের সব সুখ-শান্তি আরাম-আয়েশের বস্তুগুলো তার চোখের সামনে পড়ত। অতঃপর যদি বান্দাকে বলা হত তুমি এ দুটির যে কোন একটি বেছে নাও। তবে সেটা

আর পরীক্ষা হতো না। কিন্তু আল্লাহতা'আলা পরীক্ষাটি এমনভাবে নিয়েছেন যে, তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিকেই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জাহান্নামকে কু-প্রবৃত্তির চাহিদার বস্তু দ্বারা ঢেকে দিয়েছেন। আর সে কু-প্রবৃত্তির চাহিদাই মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যেমন, মন চায় যে, অমুক অপকর্মটি করে নেই। অথচ সে কাজটি এমন যা করলে তাকে জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে। অপরদিকে জান্নাতের উপর এমন বস্তু রেখে দেয়া হয়েছে, যেগুলো আদায় করতে বহু কষ্ট করতে হয় এবং যেগুলো আদায় করতে মন চায় না।

যেমন, খুব ভোরে আরামের ঘুম ত্যাগ করে মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করা। গোনাহের কাজ পরিহার করা ইত্যাদি। মানুষ তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সমস্ত বস্তুকে কষ্টকর মনে করে। আর জান্নাত এ সমস্ত বস্তুর অন্তরালেই রেখে দেয়া হয়েছে।

জাহান্নামের আগুন

কু-প্রবৃত্তির চাহিদার সাথে সম্পর্কিত যে সমস্ত বস্তু রয়েছে মানুষ যদি সেগুলোর পেছনে এমনভাবে চলতে শুরু করে যে, মন যা চায় তা-ই করতে থাকে। একটু চিন্তাও করে না যে, আমি যে কাজটি করছি তা কি বৈধ? তা কি শরীঅত সম্মত? তবে বুঝতে হবে যে, সে এমন পথে চলতে শুরু করেছে, যা তাকে সোজা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।

যেমন, মানুষের মন রং-তামাশার প্রতি খুব ধাবিত থাকে। পূর্বেকার দিনে তো খেলাধুলা ও রং-তামাশার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকতো। সেখানে যেতে হত। টিকেট কিনতে হত। কিন্তু বর্তমানে তো প্রত্যেক ঘরেই রং-তামাশার বস্তু প্রস্তুত রয়েছে। এ সব বস্তুর সবই কু-প্রবৃত্তির চাহিদার বাস্তবরূপ। যা পুরা করার জন্য মানুষ নিজের বহু কষ্টের টাকা-পয়সা ব্যয় করে থাকে। মার্কেটে গিয়ে কত কষ্ট সহ্য করে এ সমস্ত বস্তু ক্রয় করে আনে। যেন তারা নিজেদের ড্রয়িং রুমে ও বেড রুমে নিজের আদরের সন্তানদের জন্য জাহান্নামের আগুনের টুকরো ক্রয় করে আনছে। জান্নাতের সদাইয়ের পরিবর্তে জাহান্নামের সদাই করে এনেছে। আর এসব কাজ

এজন্য করছে যে, অন্তরে কুপ্রবৃত্তির চাহিদার পর্দা পড়ে গেছে। আর যে দিন সে পর্দা উঠে যাবে, সে দিন সব কিছুর বাস্তব চিত্র চোখের সামনে এসে পড়বে এবং বুঝতে পারবে যে, আমি যে সব কাজ করছি এর সবই আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

পক্ষান্তরে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট ও প্রবৃত্তির চাহিদার বিরোধী বস্তুসমূহ রেখে দেয়া হয়েছে। যেগুলো বিষাক্ত কাঁটার মত মনে হয়। যেমন, মানুষের মন চায় না যে, সে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করুক। তার হুকুম মানুক। কিন্তু বাস্তবে সেটা এমন রাস্তা যা তাকে চির সুখের জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। যে ব্যক্তি একটিবারের জন্য হিম্মত করে নিজেকে কু-প্রবৃত্তির ভয়াল আগ্রাসন থেকে বাঁচিয়ে, খোদা প্রদত্ত্ব রাস্তায় চালাতে থাকে। যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুব কষ্টকর মনে হয়। তবে বাস্তবে সে ব্যক্তি জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

সব আশা-অভিলাষ পুরা করার চিন্তা

উল্লেখিত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দেখ– কখনও কু-প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের পিছনে পড়তে যেও না। কারণ কু-প্রবৃত্তির চাহিদা এমন বস্তু যার কোন অন্ত নেই, নেই তার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা। দুনিয়ায় এমন কোন মানুষ নেই, (চাই সে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হোক, রাজা-বাদশা হোক, চাই সমাজের বড় সম্মানী ব্যক্তি হোক) যে একথা বলতে পারবে যে, 'আমার মন যা চায় তার সবই আমি দুনিয়াতে পূর্ণভাবে পূরণ করতে পারি, আমার মনমত সবকিছু হয়'। যত বড় সুখীই দাবী করুক, খোজ নিলে দেখা যাবে যে, সেও কোন না কোন ধরনের কষ্টে জীবন যাপন করে যাচ্ছে।

আর এর বাস্তব কারণ হচ্ছে যে, এ দুনিয়া কোন স্থায়ী শান্তির স্থান নয়। তাই এতে দুঃখ-কষ্টে জড়িত হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এ দুনিয়ায় থাকলে কষ্ট করতেই হবে। এখন যদি বান্দা স্বীয় নফসকে খোদা প্রদত্ত্ব বিধানাবলী পালনার্থে কষ্ট দেয়। (যেমন নফ্‌সকে বলে দেখ! এ কাজ করতে মহান আল্লাহতা'আলা নিষেধ করেছেন, তাই সেটা করা যাবে না। চাই এতে যত কষ্টই হোক না কেন) তবে সেটা হবে বান্দার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। আর এ রাস্তা-ই

তাকে নিয়ে যাবে চির-সুখের জান্নাতের দিকে। পক্ষান্তরে যদি সে এপথ অবলম্বন না করে, ভোগ-বিলাস ও কু-প্রবৃত্তির পথ বেছে নেয়, তবে সে সুখ কপালে জুটবেই না। বরং সেটা হবে তার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আর এ পথটিই তাকে নিয়ে যাবে শাস্তিপূর্ণ জাহান্নামের দিকে।

মানুষের মন সর্বদা ভোগ-বিলাস অন্বেষণে অভ্যস্থ

সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহতা'আলা নফস্‌কে এমন করে বানিয়েছেন যে, এ নফস সদা-সর্বদা দুনিয়ার বাহ্যিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ধাবিত থাকে। আর এ নফস মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে যে, অমুক কাজটি করে নাও খুব আনন্দ পাবে। এখন যদি কোন নির্বোধ তার পিছনে পড়ে তার অনুসরণ-অনুকরণ শুরু করে দেয়, তবে আর সে শান্তি পাবে না। তার অন্তর আর স্থির হবে না। কারণ মানুষের মন কখনও একথা বলবে না যে, আমার সকল আশা পূর্ণ হয়ে গেছে, আমার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। কেননা মানুষের সকল আশা পুরো জীবনেও পূর্ণ হওয়ার মত নয়।

আর নফসের স্বভাব এটাই যে, একটি বস্তুর আশা পূর্ণ হতেই দ্বিতীয় আরেকটির দিকে ধাবিত হয়। আবার দ্বিতীয়টি অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে তৃতীয়টি অর্জনে পাগলপারা হয়ে যায়। এভাবেই নফ্‌সের খাহেশাতের চাকা অবিরাম গতিতে ঘুরতেই থাকে।

সুতরাং মনে রাখবেন, আপনি যদি এই নফ্‌সের অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করতে চান, তা আপনার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না। জীবনে আপনি কখনও শান্তি পাবেন না। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখুন। তাই সাবধান! আপনি আপনার এ 'নফ্‌স' নামক পাগলা ঘোঁড়াকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিবেন না। কারণ যারা স্বীয় নফ্‌সকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে, তারা আর মানুষ থাকেনি, বরং তারা চতুষ্পদ জন্তুতে পরিণত হয়ে গেছে।

স্বাধ ও আমোদ-প্রমোদের কোন সীমা নেই

আজ যাদেরকে উন্নত জাতি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়, তাদের শ্লোগান হল, 'মানুষের স্বাধীন জীবনে বাধা সৃষ্টি করো না। যার মন যা চায় তাকে

তা করতে দাও। যে যা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে, তাকে তা করতে দাও। তার উপর কোন ধরনের পাবন্দী লাগাতে যেও না। তার পথে কাঁটা হয়ে দাড়িও না। তার হাতকে রুখো না।'

আপনারা আজ দেখতে পাচ্ছেন যে, মানুষের আনন্দ-বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-বিলাসের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতি ও বাধা নেই। না আছে রাষ্ট্রীয় কোন বাধা, না আছে ধর্মীয় কোন বাধা, না আছে চারিত্রিক কোন বাধা, আর না আছে সামাজিক কোন বাধা। কোন পাবন্দী নেই, প্রত্যেকেই ঐ কাজ করে যাচ্ছে, যা তার মন চায়।

যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার সকল উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে? তুমি এ দুনিয়ায় যে সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস কামনা করেছো, তা কি তোমার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছে? তবে এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ 'হ্যাঁ' বলবে না। বরং সকলেই এক বাক্যে উত্তর দিবে, আমি আরও চাই, আমার আরও অনেক আশা আছে। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একটি খাহেশ আরেকটি খাহেশকে ডেনে আনে।

আজ পাশ্চাত্যের সমাজে যদি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা পরস্পরে কামভাব পুরো করতে চায়, তবে তারা একে অপরের নিকট চলে যায়। তাদের বাধা দেয়ার মত কেউ নেই। কেউ তাদের হাতকে রুদ্ধ করতে সাহস পায় না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইরশাদ করে গেছেন তার বাস্তব রূপ আজ প্রকাশ পাচ্ছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন ব্যভিচার এত ব্যাপক হয়ে পড়বে যে, সে দিন দুনিয়ার মাঝে পূর্ণ নেককার ব্যক্তি সে-ই হবে, যে দুই ব্যক্তিকে রাস্তার উপর অপকর্মে লিপ্ত দেখবে, তখন সে তাদেরকে বাধা দিবে না যে, এ কাজটি মন্দ, এ কাজটি তোমরা করো না। বরং সে বলবে, তোমরা প্রকাশ্যে রাস্তার উপর পথচারী লোকদের সামনে এ কাজটি করো না। বরং ঐ যে গাছটি দেখা যায়, তার আড়ালে গিয়ে এ কাজ করতে পার। সেদিনের দুনিয়ায় এ ব্যক্তিই হবে সবচেয়ে বড় নেককার। আজ সে সময় প্রায় এসেই পড়েছে। আজ কোন ধরনের বাধা-বিপত্তি ব্যতিরেকে লোকালয়েই এ কাজ হতে চলেছে। তাই কোন নির্বোধ ব্যক্তি যদি হারাম পন্থা অবলম্বন করে আত্মতৃপ্তি অর্জন করতে চায়, তার জন্য দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। কিন্তু এতকিছু ফ্রি থাকা সত্ত্বেও 'জোরপূর্বক ব্যভিচার' এর ঘটনা

আমেরিকার জমিনে এত বেশী হচ্ছে, যার কোন নজীর পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রে খুজে পাওয়া যাবে না। অথচ পরস্পরে সম্মতিক্রমে এ কাজ করতে কোন বাধা নেই। যে ব্যক্তি যেভাবে চায় সে সেভাবেই তা পুরো করতে সক্ষম। এর কারণ হল সম্মতিক্রমে ব্যভিচার করে দেখেছে। এর যে মজা তাও অনুভব করেছে। কিন্তু এরপরেও খাহেশ মিটেনি। তাই এখন এ সাধ জেগেছে যে, এ কাজ এবার জোরপূর্বক করা হোক তবে এ অবস্থার স্বাধও আস্বাদন করা যাবে।

তাই বলা হয়েছে যে, মানুষের কোন আকাঙ্খাই নির্দৃষ্ট কোন মন্‌জিলে গিয়ে থামে না বরং তা অবিরাম গতিতে চলতেই থাকে। শুধু তাই নয় বরং দিন দিন তা বাড়তে থাকে। মোটেও কমে না।

আপনারা হয়ত 'জু'উল বাকার' অর্থাৎ 'প্রচণ্ড ক্ষুধা' নামক একটি রোগের কথা শুনেছেন। এ রোগের স্বভাব হলো যে, এ রোগ যার হয় তার সর্বদা শুধু ক্ষুধা লেগেই থাকে। মন যা চায়, যত চায় খেতেই থাকে। কিন্তু তার ক্ষুধা নিবারণ হয় না। এমনিভাবে আরেকটি রোগ আছে যাকে 'ইস্‌তেস্‌কা' বলা হয়। এই রোগের বৈশিষ্ট্য হল যে, যার এ রোগ হয়, সে শুধু পানি পান করতে থাকে। শুধু কলসী, কলসী নয় বরং পূর্ণ কুপের পানিও যদি পান করে ফেলে তবুও তার পানির পিপাসা নিবারণ হয় না। ঠিক তেমনি অবস্থা হল মানুষের খাহেশাতে নফসানীর। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কন্ট্রোল না করা হবে, একে শরীঅতের আওতাভুক্ত করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি ইস্‌তেস্‌কার রোগীর মত একের পর এক স্বাধ অন্বেষণ করতেই থাকবে। কোন মন্‌জিলে গিয়ে সে দাঁড়াবে না। অবিরাম গতিতে চলতেই থাকবে। তার স্বাধ জাগতেই থাকবে।

হযরত থানভী (রহঃ)-এর দৃষ্টিতে গোনাহের দৃষ্টান্ত

গোনাহ করার ভিতর আনন্দ অনুভূত হয়। আর দুনিয়ার মাঝে এটাই পরিষ্কার বিষয় যে, গোনাহ দেখতে ভাল লাগে, অন্তর গোনাহের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) গোনাহের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন, গোনাহ করে তৃপ্তি অর্জনকারীর দৃষ্টান্ত হল, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, খুজলী বা চুলকানি রোগে আক্রান্ত। সে ব্যক্তি চুলকিয়ে খুব শান্তি অনুভব করে। তাকে এ কাজ থেকে বাধা দিলেও সে শুনে না। কারণ যতই চুলকায় ততই শান্তি অনুভব করে থাকে। কিন্তু

চুলকানো শেষ হওয়ার পর সে স্থানে যে জ্বালা-পোড়া ও যন্ত্রণা শুরু হয়, তা পূর্বের সে ক্ষণিকের আরামকে হার মানিয়ে দেয়। তখন সে আফসোস করতে থাকে, হায়! কেন এমনভাবে চুলকাতে গেলাম? যদি এমনভাবে না চুলকাতাম তাহলে এখন এত কষ্ট সহ্য করতে হতো না। ঠিক তেমনি হল গোনাহের অবস্থা। যার তৃপ্তি অবাস্তব ও অস্থায়ী। যখন অন্তর চক্ষু খুলে যাবে, তখন বুঝে আসবে যে, হায়রে! এ সামান্য সময়ের আনন্দের জন্য এমন জঘন্য কাজ করলাম? কিন্তু সে সময় শত সহস্র আফসোস করেও কোন লাভ হবে না। কিন্তু যখন আল্লাহতা'আলা অন্তরে তার যিকির ও ফিকিরের স্বাধ দান করে দিবেন এবং তার গভীর ভালবাসা দান করবেন, তখন এত বাস্তব ও স্থায়ী আনন্দ অনুভব হবে, যার মোকাবেলায় দুনিয়ার এই ক্ষণিকের আনন্দের কোন তুলনাই হতে পারবে না।

এ নফ্‌স দুর্বলদের উপর সিংহের ন্যায়

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, দেখ! এ নফসের খাহেশাতের পেছনে পড়ো না, এর অনুসরণ করতে যেও-না। কারণ এ নফ্‌স তোমাকে ধ্বংসের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন কুপে নিক্ষেপ করবে। তাই একে কন্ট্রোল করে শরীঅতের আওতাভুক্ত করে নাও। আর প্রথম প্রথম এ কাজটি করতে গিয়ে তোমাকে একটু ধাক্কা খেতে হবে। দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে দৃঢ়পদ থাকতে হবে। যেমন, নফসের খাহেশ হল, একটু টিভি দেখি এবং তার মধ্যে যে ছবি আসছে তা দেখে নেই। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই এ কাজে অভ্যস্থ, তাকে যদি বলা হয় যে, তুমি নফসের এই খাহেশের উপর আমল করো না। অর্থাৎ, টিভি দেখো না। তখন সে ব্যক্তি যদি তা না দেখে এবং স্বীয় চক্ষুকে এ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তবে প্রথম প্রথম তাকে এ কাজটি করতে কষ্ট অনুভব হবে। কারণ যেহেতু সে পূর্ব থেকে এ কাজে অভ্যস্থ ছিল। কিন্তু আল্লাহতা'আলা নফ্‌সকে এ বৈশিষ্ট্যও দান করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কষ্ট-ক্লেশ হওয়া সত্ত্বেও বাহাদুরের ন্যায় একবার দাড়িয়ে বলে যে, যত কষ্টই হোক, চাই এ নফ্‌স করাতের আঘাতে দু টুকরো হোক। তবুও এ কাজ আমি করবো না। তবে সে দিনেই এ নফ্‌স অনায়াসে তার নিয়ন্ত্রণে এসে পড়বে। কারণ 'নফ্‌স' সাধারণত ঐ সমস্ত লোকদের উপর বাঘের ন্যায়, যারা দুর্বল। যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে তার

সামনে ভিজে বিড়ালের ন্যায় পেশ করে, তখন সে তার উপর ভয়ংকর আগ্রাসী থাবা মেরে তাকে নিস্তেজ করে দেয় এবং সে তার সকল আশা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন নির্ভীক বাহাদুর সিংহের ন্যায় তার সামনে দাড়িয়ে যায় এবং দীপ্ত কণ্ঠে বলে 'আমি তোমাকে আমার উপর কর্তৃত্ব চালাতে দেব না'। তবে সে ব্যক্তি নফ্সের আগ্রাসী থাবা থেকে বেঁচে যাবে এবং এ কাজে যদিও প্রথম প্রথম তার কিছুটা কষ্ট হবে, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথম দিন তার যে পরিমাণ কষ্ট হয়েছে, দ্বিতীয় দিন তার থেকে কম হবে। তৃতীয় দিন এর চাইতে আরও কম হবে। এভাবে অবাধ্য নফ্স একদিন তার আয়ত্ত্বে এসে পড়বে ইনশাআল্লাহ।

নফ্স দুধ পানকারী ছোট বাচ্চার ন্যায়

আল্লামা বুসাইরী নামে একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। তার 'কাসীদায়ে বুরদা' খুবই প্রসিদ্ধ কাব্য। যা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে করেছেন। সে কাব্যগুলোর মধ্য থেকে একটি হেকমতপূর্ণ পংক্তি হল–

النفس كا الطفل ان تهمله شب على – حب الرضاع وان تفطمه ينفطم

অর্থাৎ, নফ্স হল দুধ পানকারী ছোট বাচ্চার ন্যায়। যদি তুমি একে প্রশ্রয় দাও, তবে সে দুধ পান করার জন্য নিত্য-নতুন বাহানা বের করবে। আর যদি জোরপূর্বক তার দুধ ছাড়িয়ে নাও, তবে সে দুধ পান ত্যাগ করে দিবে।

ব্যাখ্যাঃ মানুষের নফ্সকে উপমা দেয়া হয়েছে ঐ বাচ্চার সাথে যে, মায়ের স্তন থেকে দুধ পান করে এবং যে এতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় যদি তাকে দুধ পান করা থেকে বারণ করা হয় তবে সে চিৎকার করবে, কাঁদবে। এখন যদি কোন মা-বাবা চিন্তা করে যে, দুধ ছাড়াতে গেলে যেহেতু তার কষ্ট হয়, তাই তার দুধ ছাড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। তাকে দুধপান করতে দেয়া হোক। তাহলে সে (বড় হয়েও) দুধ পান করতেই থাকবে।

আল্লামা বুসাইরী (রহঃ) বলেন, যদি বাচ্চাকে এভাবে দুধ পান করার সুযোগ দেয়া হয়, তবে এর পরিণাম এ দাঁড়াবে যে, সে জওয়ান হয়ে যাবে কিন্তু তার থেকে দুধ ছাড়ানো যাবে না। যদি তাকে রুটি খেতে দেয়া হয়

তবে সে বলবে, না আমি রুটি খাবনা। আমি দুধ পান করবো। কিন্তু এ পৃথিবীতে এমন কোন মা-বাবা পাওয়া যাবে না, যারা বলবে যে, এর যেহেতু কষ্ট হচ্ছে তাই এর দুধ ছাড়ানোর প্রয়োজন নেই। একে দুধপান করতেই দাও। মা-বাবা জানেন যে, দুধ ছাড়াতে গেলে এ বাচ্চা কাঁদবে, চিৎকার করবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা জোরপূর্বক দুধ ছাড়িয়েই দিবেন। কারণ তারা জানেন যে, এ বাচ্চার কল্যাণ দুধ ছাড়ানোর মধ্যেই নিহিত। আজ যদি তার দুধ ছাড়ানো না হয়, তবে জীবনে আর কোন দিন তার দুধ ছাড়ানো সম্ভব হবে না।

তাই আল্লামা বুসাইরী (রহঃ) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মানুষের নফ্সও হল এ বাচ্চার ন্যায় তার মুখে গোনাহের স্বাধ দীর্ঘদিন থেকে লেগে আছে, সে গোনাহের স্বাদ আস্বাদন করে আসছে। নফ্স যা করতে চেয়েছিল, সবই আপনি তাকে করতে দিয়েছেন। অবৈধ স্থানে দৃষ্টি ফেলতে দিয়েছেন। যবানকে মিথ্যা বলতে অভ্যস্থ করেছেন। গীবত করতে দিয়েছেন। সুদ গ্রহণে অভ্যস্থ করেছেন। এ ধরনের আরও অনেক গোনাহে অভ্যস্থ করেছেন। এখন যদি আপনি একে হঠাৎ করে গোনাহ করতে বাধা দেন, তবে প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু এ কষ্টের সাথে সাথেই আপনার জন্য চির-সুখের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আপনি নফ্সের কষ্টকে কষ্ট মনে করে ঘাবড়িয়ে যান এবং একে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই চালাতে শুরু করেন, তবে মনে রাখবেন! জীবনে কখনও আপনার এ নফ্স কন্ট্রোলে আসবে না। আর আপনি পাপের জগত থেকে বের হয়েও আসতে পারবেন না।

আল্লাহর যিকিরেই আত্মার প্রশান্তি

মনে রাখবেন, আল্লাহর নাফরমানীর মধ্যে কোন প্রশান্তি আর স্বাধ নেই। দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ ও টাকা-কড়ি যদি আপনি অর্জন করেন, তবুও আপনি সুখ-শান্তি অর্জন করতে পারবেন না। আমি একটু পূর্বে পাশ্চাত্যের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করেছি। তাদের ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার বাজার খুব গরম। শিক্ষাগত দিক দিয়েও তারা উন্নত। এক কথায় সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ অর্জন করার সকল পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত। যেভাবে চায় সেভাবেই আরাম করতে পারে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তাদের অবস্থা হল যে, তারা ঘুমানোর সময় ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমায়। তাদের অন্তরে একটুও সুখের ছোঁয়া নেই। তবে প্রশ্ন হল, কেন এ অশান্তি?

খোঁজ নিলে উত্তর এটিই দাড়াবে যে, তারা গোনাহের পথ অবলম্বন করে শান্তি অর্জন করতে চাচ্ছে। অথচ আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেনঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকিরের মধ্যে আত্মার প্রশান্তি নিহিত।

ব্যাখ্যাঃ মনে রাখবেন, খোদাদ্রোহীতা ও তার নাফরমানীর ভিতর দিয়ে কস্মিনকালেও শান্তি অর্জিত হতে পারে না। শান্তির পথ একটিই আর তাহলো 'আল্লাহর যিকির' আল্লাহর স্মরণেই রয়েছে আত্মার প্রশান্তি। আর তিনি শান্তি ঐ ব্যক্তির অন্তরেই দান করে থাকেন, যার অন্তরে তাঁর মহব্বত আছে। যার অন্তর তাঁর যিকির দ্বারা আবাদ ও তরুতাজা রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখবেন যে, তারা খুব পেরেশান অবস্থায় আছে। খুব দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু তাদের অন্তরে প্রশান্তির নে'আমত বিরাজমান। তাই দুনিয়ার ভিতরে যদি সুখ-শান্তি পেতে চান, তাহলে আপনাকে সমস্ত গোনাহ পরিহার করতে হবে। আর সে জন্য একটু মুজাহাদা ও মেহনত করতে হবে। তবেই সব কিছু সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হতে পারে না

আল্লাহতা'আলা পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ, যারা আমার পথে মেহনত ও মুজাহাদা করবে পরিবেশ, সমাজ, নফ্স, শয়তান ও কু-প্রবৃত্তি ইত্যাদি সবকিছুর মোকাবেলা করে আমার হুকুম পালন করবে, আমি তাদেরকে নিশ্চয় আমার পর্যন্ত পৌছার সকল রাস্তা দেখিয়ে দেব।

আয়াতের শেষ অংশের তাফসীরে হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আমি তাদেরকে নিশ্চয় আমার পর্যন্ত পৌছার সকল রাস্তা দেখিয়ে দেই'। এই আয়াতের তাফসীর এটা নয় যে, দূর থেকে আমি রাস্তা দেখিয়ে দেই যে, দেখ! 'এটা হচ্ছে সঠিক পথ'। এর উপর চল। বরং আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তাদের হাত ধরে মনজিলে মাকসাদ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেই।'

সুতরাং বান্দার পক্ষ থেকে কমপক্ষে কদম তো উঠাতে হবে, ইচ্ছা তো করতে হবে। নিজের নফ্সের মোকাবেলায় একটি বারের জন্য হলেও নির্ভীকের ন্যায় দাঁড়াতে হবে। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য নিশ্চয়ই আসবে। যার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা নিজেই করেছেন। যা কখনও মিথ্যা হওয়ার মত নয়। তাই সংশোধনের পথে সর্বপ্রথম কদম হল 'মুজাহাদা'। এর উপর দৃঢ় থাকতে হবে।

আমাদের শায়েখ ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ) এ কাব্যটি বেশী বেশী আবৃত্তি করতেনঃ

ارزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پا مال ہو

اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے

অর্থাৎ, মনে যে আকাঙ্খার তুফান বয়ে যাচ্ছে, চাই সেটা ধুলিস্মাৎ হোক, চাই সেটা রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাক। (তাতে আমার কোন পরওয়া নেই)। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেছি যে, আমার এ অন্তরকে তোমার জন্য উপযুক্ত করবো। তোমার নূরে আলোকিত করবো। তোমার মহব্বত দ্বারা ভরপুর করে দেব। এখন থেকে এ অন্তর দিয়ে আর গোনাহ করবো না।

যখন পরিপূর্ণভাবে শপথ নিবেন। দেখবেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের বারি কিভাবে বর্ষিত হয়। তবে মনে রাখবেন, প্রথম প্রথম আপনার জন্য এ কাজটি করা কষ্টকর মনে হবে। নফসতো গোনাহের কাজ করতে চাইবেই। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নফসের সে চাওয়া পাওয়াকে পরিত্যাগ করতে হবে। তবে কিছুদিন পর সে কষ্ট আর কষ্টকর মনে হবে না। বরং সে কষ্ট শান্তি ও সুখে পরিণত হয়ে যাবে। এ নফ্সকে আপনি খুন করে যে রক্তাক্ত করেছেন, তার যে কি স্বাধ তা তখনই আপনি বুঝতে পারবে।

মা কেন এত কষ্ট করেন

নিজের 'মাতা' সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখুন। তিনি কত কষ্ট সহ্য করেন। শীতের মৌসুমে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে লেপ জড়িয়ে শুয়ে আছেন। পাশে আছে তার আদরের বাচ্চা। হঠাৎ বাচ্চা প্রসাব করে দিল। তখন নফ্সের চাহিদা তো এটা হয়ে থাকে যে, এই প্রচণ্ড শীতের ভিতর গরম বিছানা ছেড়ে কোথাও লড়তে পারবো না। লেপ ছাড়া বহু কষ্ট, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মা চিন্তা করেন যে, আমার বাচ্চা ভিজে বিছানায় পড়ে আছে। তার শরীরে ভিজা কাপড় লেগে আছে। হয়ত তার ঠাণ্ডা লাগবে। অসুস্থ

হয়ে পড়বে। তাই সে বেচারী নিজের নফসের সকল চাহিদা পরিহার করে, এত কড়া শীতের ভিতরে ও পানিতে গিয়ে নিজের কাপড় ধুয়ে নেয়। বাচ্চার কাপড় পাল্টিয়ে দেয়।

এটা কোন সাধারণ কষ্ট নয়। তবে প্রশ্ন হল মা এত কষ্ট করতে যান কেন? কারণ হল যে, মা এ বাচ্চার সুস্থ্যতা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। তাই প্রচণ্ড শীত ও তার কাছে হার মানতে বাধ্য। ঠিক তেমনিভাবে আমরা যখন আধ্যাত্মিক জীবনের সুস্বাস্থ্যের ইচ্ছা করবো, তখন অন্যান্য সব কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে পড়বে।

মহব্বত কষ্টকে হার মানায়

এক মহিলার কোন সন্তান ছিল না। সে লোকদের বলত, 'তোমরা যে কোন ভাবে আমার চিকিৎসা কর এবং আল্লাহর নিকট দু'আ কর যেন তিনি আমাকে একটি সন্তান দান করেন এবং সে এর জন্য তাবীজ-তুমার সহ আরো কত কি তদবীর করে বেড়াতো। এ সময় অন্য এক মহিলার তার সাথে সাক্ষাত হলে সে মহিলা তাকে বলল, আরে! তুমি কি সন্তানের জন্য পাগলপারা হয়ে গেছো? কিন্তু চিন্তা করেছো কি, এ সন্তান হতে হলে তোমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। প্রচণ্ড শীতের রাতে উঠে ঠান্ডা পানিতে কাপড় ধুতে হবে। উত্তরে সে মহিলা বলল, আমি একজন সন্তানের জন্য হাজার কষ্ট বুক পেতে নিতে প্রস্তুত আছি।

এ মহিলা একথা এজন্য বলতে পেরেছে যে, তার অন্তরে সন্তানের মূল্য রয়েছে। তাই তার সকল কষ্ট-ক্লেশ শান্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং যে মা আল্লাহর নিকট দু'আ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাকে একটি সন্তান দাও, এর অর্থ হচ্ছে যে, সন্তানের লালন-পালনে যত জিম্মাদারী ও কষ্ট-ক্লেশ রয়েছে, তা আমাকে দাও। কিন্তু এ সমস্ত কষ্ট তার দৃষ্টিতে আর কষ্ট রূপে নেই। বরং তা শান্তিতে পরিণত হয়েছে। তাহলে যে মা কঠিন শীতের রাতে কাপড় ধুচ্ছে, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আন্তরিকভাবে সে প্রশান্তি অনুভব করছে এ ভেবে যে, আমি এ কাজ আমার সন্তানের কামিয়াবীর জন্যই করছি। আর যখন এ প্রশান্তি লাভ হয়, তখন তার আশা-আকাঙ্খার সাগরে শান্তির ঢেউ বয়ে যায়। এ কথাটিকে হযরত মাওলানা রূমী (রহঃ) এভাবে উল্লেখ করেনঃ

از محبت تلخها شیریں شود

অর্থাৎ, যখন মহব্বত সৃষ্টি হয়, তখন তিক্তের চেয়ে তিক্ত বস্তুও মিষ্টি মনে হয়। যে কাজগুলো করতে কষ্ট মনে হত, মহব্বতের কারণে করতেও আনন্দ অনুভুত হয়। প্রশান্তি লাভ হয়।

মাওলার মহব্বত লায়লার মহবব্বতের চাইতে কম নয়

হযরত মাওলানা রূমী (রহঃ) ভালবাসার এক বিরল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন, তাহল 'লাইলী ও মজনুর ঘটনা'। তিনি বলেন, মজনু লায়লার জন্য খুবই পাগলপারা ছিল। তার জন্য বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করত। তার জন্য দুধের ঝর্ণা প্রবাহিত করার মনস্থ করে এর কাজে হাতও দিয়েছিলো। তার এ সমস্ত কষ্ট দেখে এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, মজনু! তুমি কেন এত কষ্ট করছো? এসব তুমি পরিহার কর। উত্তরে মজনু বলল, আমার হাজারো কষ্ট উৎসর্গ হোক। আমি এতে কোন পরওয়া করি না। আরে আমি তো দুধের ঝর্ণা প্রবাহিত করার মত কষ্টও সহ্য করতে প্রস্তুত। কারণ আমি যা করছি সবই আমার লায়লার ভালবাসা ও মহব্বতেই করছি। তাই এতে আমি প্রশান্তি অনুভব করছি। মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেনঃ

عشق مولی کئے کم از لیلی بود

گوئے گشتن بهر او اولی بود

অর্থাৎ, মাওলার (স্থায়ী) ভালবাসা কখনও লায়লার (অস্থায়ী) ভালবাসার চাইতে কম হতে পারে না। বরং মাওলানার জন্য পাগল হওয়া লায়লার জন্য পাগল হওয়া থেকে অতি উর্ধ্বে।

সুতরাং মানুষ মহব্বতের বশবর্তী হয়ে যে কষ্ট করে, তা বাস্তবে প্রশান্তিমূলকই হয়ে থাকে। তাই গোনাহ থেকে বাঁচতে গিয়ে যে কষ্ট অনুভব হয়, তা যদি আল্লাহর মহব্বতে হয়ে থাকে তবে তা আর কষ্ট থাকবে না। শুধু প্রশান্তি অনুভব হবে।

বেতনের মহব্বত

এক লোক চাকুরী করে। তাই তার খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়। প্রচন্ড শীতের দিনে যদি কম্বলের নিচেও শুয়ে থাকে তবু যখন

অফিসে যাওয়ার সময় হয়, তখন তাকে কম্বল লাথি মেরে, সবকিছু ছেড়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়। মন তো চায় গরম বিছানায় শুয়ে থাকতে, বিবি, বাচ্চাদের মাঝে মিশে থাকতে, কিন্তু এসব কিছু ছেড়ে তাকে চলে যেতেই হয়। সারাদিন কষ্ট করে ঘরে ফিরে আসে। বহু লোক এমনও আছে যারা নিজেদের বাচ্চাদের সকাল বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে চলে যায়। আবার রাতের বেলা ফিরে এসে ঘুমন্ত অবস্থায়ই পায়। নিজের বাচ্চাদেরকে একটু আদর-স্নেহ করার সময়টুকুও পায় না। মূল কথা সে ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

এখন যদি কোন ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করে, আরে ভাই! এ চাকুরী তো আপনার জন্য অনেক কষ্টকর। চল তোমাকে এ চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেই। সে বলবে, না, কখনও নয়। অনেক কষ্ট করে এ চাকুরী পেয়েছি। আপনি আমার এ চাকুরী ছাড়াতে যাবেন না। তাহলে বুঝা গেল যে, এ ব্যক্তি সকাল সকাল ঘুম ত্যাগ করে অফিসে/কর্মস্থলে যাওয়ার মধ্যে আনন্দ অনুভব করছে। নিজের স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে চলে যাওয়াতে প্রশান্তি লাভ করছে। তবে কেন? তার কারণ এ চাকুরীর বেতনের সাথে মহব্বত জন্মে গেছে। যা সে মাস শেষ হওয়ার পরেই পাবে। এই মহব্বতের টানেই তার সকল কষ্ট-ক্লেশ আরামে পরিণত হয়েছে। যদি কখনও তার এই চাকুরী ছুটে যায়, তখন সে দুঃখ পায় এবং ক্রন্দন করে বলে, হায়! কোথায় গেল আমার সেই হারানো দিনগুলো। যে দিনগুলোতে আমি ভোরে ঘুম থেকে উঠে চাকুরীতে যেতাম এবং মানুষের নিকট ঘুরে ঘুরে সুপারিশ করতে থাকে এবং বলে ভাই! আমার এ চাকুরিটি আবার আমাকে ফিরিয়ে দাও।

সারকথা যদি কোন বস্তুর সাথে মহব্বত জন্মে যায়, তবে সে পথের সকল কষ্ট-ক্লেশ, আরাম-আয়েশ ও প্রশান্তিতে পরিণত হয়ে যায় এবং এতে সে সুখ পায়।

এমনিভাবে গোনাহ ত্যাগ করার মধ্যেও নিশ্চয় প্রথম প্রথম কষ্ট হবে। কিন্তু যখন একবার দৃঢ়পদ হয়ে দাঁড়াবেন এবং আল্লাহর হুকুম মত আমল শুরু করবেন, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। অতঃপর সব কষ্ট শান্তিতে পরিণত হয়ে যাবে।

আল্লাহওয়ালাদের উক্তি

আমাদের শায়খ আল্লামা ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ) বলেন, মানুষের অন্তর সর্বদাই ভোগ-বিলাস স্বাধ আর মজা অন্বেষণে লিপ্ত। তবে তার স্বাধ আর আনন্দ নির্দিষ্ট কোন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত নয়। তার কাজ হল শুধু আনন্দ উপভোগ করা। এখন যদি এ নফ্সকে অশ্লীল, অবৈধ ও অনুচিৎ কাজে অভ্যস্থ করো তাহলে সে তাতেই অভ্যস্থ হবে। আর যদি সৎ কাজে অভ্যস্থ করো তাহলে সে সৎ কাজের মধ্যেই আনন্দ উপলব্ধি করবে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মেহেরবাণী ও দয়া দ্বারা আমাদেরকে ইলম, ইবাদত ও তার স্মরণের যে স্বাধ দান করেছেন, তা যদি দুনিয়ার বড় বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি জানতো, তবে তারা তলোয়ার উচিয়ে আমাদের নিকট আসতো এবং বলতো যে, আমাদেরকে এ স্বাধ দিয়ে দাও। কিন্তু সে হতভাগারা জানে না যে, আমরা শান্তির কোন জগতে বসবাস করছি। কত সুখে জীবন যাপন করছি। এ সুখের ছোঁয়া তাদের জীবনে কখনও লাগেনি। তাই তারা মনে করছে যে, গোনাহের ভেতর দিয়েই শান্তি অর্জন করা যায়। কিন্তু বাস্তবিক শান্তিতো আল্লাহ তা'আলার স্মরণে নিহিত রয়েছে।

প্রখ্যাত কবি 'গালেব' এর প্রসিদ্ধ কাব্যের একটি পংক্তি–

مجھے تو دن رات بے خودی چاہئے

অনেকে এই পংক্তিটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আমাদের শায়খ ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ)-এর খুব সুন্দর একটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাহল,

مے سے عرض نشاط ہے کس روسیاہ کو

اك گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہئے

অর্থাৎ, মদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি তো দিবা-রাত্র 'আত্মহারা'র প্রশান্তি চাই। তুমিই আমাকে মদ পানে অভ্যস্থ করেছো। তাই আমি মদ পানে আত্মহারা হয়ে পড়েছি। এর ভিতর দিয়েই আত্মতৃপ্তি লাভ করছি। আহ! যদি তুমি আমাকে আল্লাহর স্মরণে অভ্যস্থ করতে। তাঁর ইবাদতে অভ্যস্থ করতে, তবে তো আমি তার যিকিরেই আত্মহারা হয়ে

যেতাম। এতেই প্রশান্তি লাভ করতাম। কিন্তু আফসোস! তুমি আমাকে খোদা প্রদত্ত্ব স্বাধের পরিবর্তে মদ পানে অভ্যস্থ করেছো।

নফসের বিরুদ্ধাচারণে স্বাদ পাবে

এমনিভাবে 'মুজাহাদা' প্রথম প্রথম খুব দুষ্কর মনে হবে। মনে হবে কত কঠিন সবক দেয়া হচ্ছে যে, স্বীয় নফসের মোকাবেলা কর, কু-প্রবৃত্তির মুকাবেলা কর। যেমন, মন তো চায়, গীবত করি। হঠাৎ গীবতের সুযোগ হয়ে গেল, এখন মনতো চায় গীবতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে। কিন্তু এই মুহূর্তে, নফ্সকে বাধা দিতে হবে যে, না, একাজ করা যাবে না। এভাবে বাধা দেয়া অনেক কষ্টের কাজ। তবে মনে রাখবেন! দূর থেকে এটাকে খুব কষ্টকর মনে হলেও। কিন্তু মানুষ যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় যে, একাজ করবই না। তখন আল্লাহর রহমত ও তার মেহেরবাণীতে সাহায্য আসবেই। অতঃপর আপনি যে আপনার স্বাধ ও আকাংখাকে ধুলিস্মাৎ করেছেন। এর কারণে আপনি যে ঈমানের স্বাদ পাবেন তার মোকাবেলায় গীবতের স্বাদের কোন মূল্যই হতে পারে না।

ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করুন

হাদীছ শরীফে এসেছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তির অন্তরে অবৈধ স্থানে (যেমন– বেগানা মহিলার প্রতি) দৃষ্টি দেয়ার ইচ্ছা হল এবং দেখার জন্য অন্তর ছটফট করছে কিন্তু সে একমাত্র আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল এবং সেদিকে তাকালো না। যার ফলে তার অন্তরে প্রচন্ড আঘাতও লাগল। যেন অন্তর করাত দ্বারা টুকরো করা হচ্ছে। তার এ আঘাতের পরিবর্তে আল্লাহতা'আলা তাকে ঈমানের এমন স্বাদ দান করবেন। যার মোকাবেলায় সেদিকে তাকিয়ে আনন্দ উপভোগ করা নিতান্তই তুচ্ছ। (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬৪)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ওয়াদা শুধু কু-দৃষ্টি থেকে বাঁচার সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সব ধরনের গোনাহ সম্পর্কেই এই

ওয়াদা রয়েছে। যেমন, গীবত করতে খুবই মজা লাগে। তাই গীবত করছিল। হঠাৎ আল্লাহর ভয় অন্তরে আসার সাথে সাথে গীবত থেকে বিরত রইলো। এভাবে কিছুদিন বিরত থাকার পর, ঈমানের স্বাধ আস্বাদন করতে সক্ষম হবে।

বাস্তবেই মানুষ যখন গোনাহের স্বাদের মোকাবেলায় ঈমানী স্বাদে অভ্যস্থ হয়ে পড়বে, তখন তার অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত সৃষ্টি হবে এবং তাঁর সাথে আল্লাহর গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

আত্মশুদ্ধির মূলতত্ত্ব

হাকীমুল উম্মত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন। যা স্মরণ রাখার মত। তিনি বলেন, 'তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধির মূলতত্ত্ব হল, 'যখন কোন সৎ কাজ করতে গিয়ে অন্তরে অলসতা আসে। (যেমন নামায পড়ার সময় হয়েছে কিন্তু এতে অলসতা লাগছে) তখন সে অলসতাকে দূর করে ইবাদতে মগ্ন হবে। গোনাহ থেকে বাঁচতে মন চাচ্চে না, কষ্টকর মনে হচ্ছে, তখন অবাস্তব ধারনায় ও অলসতায় পদাঘাত করে গোনাহ ত্যাগ করবে। ব্যস! এর দ্বারাই আল্লাহর সাথে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে এবং সে মুহাব্বত ধীরে ধীরে গাঢ় হবে। আর যার এ জিনিস অর্জিত হয়েছে তার দুনিয়ার আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। তাই যখন বান্দা যখন আল্লাহর মহব্বতে গোনাহ ত্যাগ করার জন্যে অন্তরে ধারালো করাত চালায় এবং হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে, তখন তার অন্তর আল্লাহর নূরে আলোকিত হয়।

অন্তরতো ভাঙ্গাঁরই জন্য

আমার পিতা, হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) একটি দৃষ্টান্ত দিতেন যে, এখন তো সে যুগ চলে গেছে। পূর্বেকার যুগে 'ইউনানী' হাকীম ছিলো। তারা 'কুশতা' নামক হালুয়া বানাতো। সে হালুয়া বানাতে গিয়ে তারা স্বর্ণকে আগুনে খুব জ্বালাতো। এত বেশী সময় তা জ্বালাতো যে, জ্বলতে জ্বলতে সে স্বর্ণ ছাই হয়ে যেত এবং তারা বলতো স্বর্ণকে যত বেশী জ্বালানো হবে, হালুয়া ততই বেশী শক্তিশালী হবে। যখন জ্বলে জ্বলে সে

স্বর্ণ শক্তিশালী হালুয়ায় পরিণত হতো। তখন যদি এই হালুয়া থেকে সামান্যও কেউ খায়, তবে সে তাতে অসাধারণ শক্তি অনুভব করে। যখন স্বর্ণ পুড়ে পুড়ে নিজের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দিয়ে ছাইয়ে পরিণত হয়েছে, তখন সেটি শক্তিবর্ধক হালুয়ায় পরিণত হতে পেরেছে। এ থেকে আমার পিতা বুঝাতেন যে, এমনিভাবে যখন খাহেশাতে নফ্সানীকে পদদলিত করবে এবং পিষে পিষে তার অস্তিত্বকে বিলীন করে দিবে, তখন সে অন্তর হালুয়ার ন্যায় শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং সেটি আল্লাহর নূরে আলোকিত হয়ে যাবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মধ্যে গভীরতা সৃষ্টি হবে এবং এ অন্তরকে যতই ভাঙ্গা হবে আল্লাহর নিকট সেটি ততই প্রিয় হবে।

কবি বলেনঃ

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ ائینہ ہے وہ آئینہ

جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

অর্থাৎ, তুমি এতে যতই আঘাত করবে, সেটি আল্লাহর দৃষ্টিতে ততই প্রিয় হয়ে উঠবে। সৃষ্টিকর্তা তো একে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন যে, একে ভাঙ্গা হবে। তার খাহেশাতকে চুরমার করা হবে। আর যখন সেটি চুরমার হবে, তখন তার দ্বারা অনেক কিছু করা সম্ভব হবে।

আমাদের শায়খ ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ) বলেনঃ

یہ کہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا

اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

সারকথাঃ সৃষ্টিকর্তা যা চান সবই পারেন। তাই খাহেশাতে নফসানীকে বাধা দিতে গিয়ে যে কষ্ট অনুভব হয়, মনে করবেন না যে, সেটা অনর্থক। বরং এ কষ্টের পর যখন অন্তর আল্লাহর ভালবাসার পাত্র হয়ে যাবে এবং তার যিকির ও ধ্যান করতে মন চাইবে, তখন অন্তরে প্রশান্তি লাভ হবে। আল্লাহর শপথ! এ স্বাদের মুকাবেলায় গোনাহের স্বাদ একেবারেই তুচ্ছ। যার কোন বাস্তবতা নেই। আল্লাহতা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে কথাগুলো অনুধাবন করে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

গোনাহের ক্ষতিসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال له رجل: رجل قليل العمل قليل الذنوب اعجب اليك او رجل كثير العمل كثير الذنوب قال لاعدل بالسلامة

অর্থাৎ, একজন লোক হযরত আবদুল্লাহ[১] ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন ব্যক্তি যে স্বল্প আমল করে (অর্থাৎ নফল ইবাদত

---

১. টীকাঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। আর হযরত আব্বাস (রাযিঃ) ছিলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা। তারই সুযোগ্য সন্তান ছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব কম সময় পেয়েছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। কম বয়স হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলমের উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। তার কারণ হল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তার জন্য দু'আ করেছিলেন– اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ হে আল্লাহ! তাকে তোমার কুরআনের জ্ঞান দান কর। আর তাকে দ্বীনের ফকীহ্ বানাও।' এত কম বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সব কথাকে নিজের অন্তরে বসিয়ে নিতেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন, তখন তিনি চিন্তা করলেন যে, যদিও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় নিয়ে গেছেন কিন্তু তার হাতের গড়া বড় বড় সাহাবা তো এখনও আছেন। তাই তিনি সাহাবায়ে কিরামের নিকট যেতেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসকে মুখস্থ করতেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সন্ধানে অনেক সফর করেছেন এবং বহু কষ্ট করেছেন। এভাবে তিনি ইলম অর্জন করেন এবং ইলমের এমন উচ্চ আসনে সমাসীন হন যে, আজ সবাই তাকে এক বাক্যে ইমামুল মুফাস্‌সিরীন তথা সমস্ত মুফাস্‌সিরগণের ইমাম বলতে বাধ্য। কুরআনের তাফসীরের মধ্যে তার কথার মত অন্য কারো কথা গ্রহণযোগ্য হয় না।

তথা– নফল নামায, যিকির-আযকার ইত্যাদিতে তেমন বেশী লিপ্ত হয় না। অধিকাংশ সময় শুধু ফরয, ওয়াজিবগুলো আদায় করে) কিন্তু তার গোনাহও কম। এ ব্যক্তি আপনার নিকট বেশী পছন্দনীয়, নাকি ঐ ব্যক্তি যে, নফল ইবাদত বেশী করে সাথে সাথে গোনাহও অনেক করে? (যেমন তাহাজ্জুদের নামাযও পড়ে, ইশরাকের নামাযও পড়ে, আউয়াবীন নামাযও পড়ে, খুব বেশী তেলাওয়াতও করে। কিন্তু সাথে সাথে গোনাহের কাজেও জড়িত হয়)।

উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, 'গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সমান আমল আমি অন্য কোনটিকে পাই না।' অর্থাৎ মানুষ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, এটা এমন এক নেআমত এবং গুরুত্বপূর্ণ আমল যার সমান অন্য কোন আমল নেই।

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাঁর এই বাণীতে একথা বুঝাচ্ছেন যে, নফল নামায যতই আদায় করা হোক না কেন, তা নিজ নিজ স্থানে ফযীলতপূর্ণ। কিন্তু মানুষ যদি এ সমস্ত নফল নামাযের উপর ভরসা করে এ চিন্তা করে যে, আমি তো অনেক নফল ইবাদত করেছি। তাই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার এত বেশী প্রয়োজন নেই। তবে সে ব্যক্তি একান্তই ধোঁকার মধ্যে আছে। কারণ মানুষের জীবনের সবচেয়ে বেশী লক্ষ্যনীয় বিষয় হল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। যেমন, কেউ যদি জীবনে কোন নফল ইবাদত করতে নাও পারে, কিন্তু গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযাত পাবে ইনশাআল্লাহ। পক্ষান্তরে যদি নফল ইবাদত খুব করল। কিন্তু সাথে সাথে গোনাহও করল, তবে সে ব্যক্তির নাযাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

গোনাহের ব্যাপারে সবাই উদাসীন

আজ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সবাই উদাসীন। আজ যদি আমাদের মধ্যে কারো দ্বীনের উপর চলার স্পৃহা হয় এবং আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার তাওফীক হয়, তখন আমরা এ চিন্তা করি যে, আমাকে কিছু ওযীফা দেয়া হোক। যিকির-আয্‌কার এবং নফল ইবাদত আদায়ের পদ্ধতি বলে দেয়া হোক। আর আমি সে নফল ইবাদতগুলো আদায় করতে গিয়ে দিন-রাত মেহনত করি। কিন্তু এ চিন্তা কেউ করে না যে, সকাল থেকে

নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি কতগুলো গোনাহের কাজ করছি? কতগুলো কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিপন্থী করেছি। অনেক ভাল শিক্ষিত দ্বীনদারদেরকেও দেখেছি, যারা মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, নফল আদায় করে, তাহাজ্জুদ, ইশরাক সব ইবাদত পাবন্দীর সাথে আদায় করে যাচ্ছে। কিন্তু এই চিন্তা করে না যে, আমার ঘরে যে গোনাহের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, হারাম ও নাজায়েয বস্তু চালু আছে, গান চলছে, ফিল্ম চলছে এগুলোকে কিভাবে সংশোধন করা যায়। কিভাবে এগুলো বন্ধ করা যায়। নিজে যখন বাজারে যায় তখন হারাম-হালালের কোন ভেদাভেদ করে না। কথা বলার সময়, গীবত করে তার দিকে কোন লক্ষ্য নেই। লক্ষ্য শুধু নফল ইবাদাতের প্রতিই নিবদ্ধ। অথচ গোনাহ মানুষকে ধ্বংসকারী। এ থেকে বাঁচার চিন্তা করা একান্ত কর্তব্য।

নফল ইবাদত ও গোনাহের দৃষ্টান্ত

নফল ইবাদত ও গোনাহের দৃষ্টান্ত হল এমন যে, যত নফল ইবাদত আছে সব হল ভিটামিনের মত। যার দ্বারা শক্তি অর্জিত হয়। আর গোনাহ হল বিষের মত। এখন যদি কোন ব্যক্তি ভিটামিনও খুব খায় সাথে সাথে বিষও খায়, তবে এর পরিণাম এ দাঁড়াবে যে, এ ভিটামিন এ বিষের উপর কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারবে না। পক্ষান্তরে এ ভিটামিনের উপর সে বিষ প্রবল হয়ে যাবে। আর সে ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হবে।

অন্য এক ব্যক্তি যে, কোন ভিটামিন খায় না। শুধু ডাল-রুটি খায়। কিন্তু যে সমস্ত বস্তু শরীরের জন্য ক্ষতিকারক সেগুলো থেকে বেঁচে থাকে, তবে এ ব্যক্তি সুস্থ থাকতে পারবে। অথচ সে কোন ভিটামিন খায় না। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি যে ভিটামিনও খায়, সাথে ক্ষতিকারক বস্তু থেকে বেঁচে থাকে না। তবে এমন ব্যক্তি নিশ্চিত অসুস্থ হয়ে পড়বে।

নফল ইবাদত আর গোনাহের অবস্থাও হল ঠিক তেমনি। তাই এ চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত কতগুলো গোনাহ হচ্ছে এবং এ চেষ্টা করতে হবে যেন সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের পক্ষ থেকে কোন গোনাহ না হয়। যদি গোনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব না হয় তবে শুধু নফলে কোন ফায়দা হবে না।

হযরত থানভী (রহঃ)-এর সংশোধনের পদ্ধতি

আজকের অবস্থা হল যে, যদি কোন ব্যক্তি শায়খের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করে, তখন শায়খ তাকে প্রথম দিনেই সব সবক দিয়ে দেয়। বলে যে, এত হাজার বার এ যিকির করবে, এত হাজার বার এই তাসবীহ পড়বে। কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর নিয়ম ছিল যে, যখন কোন ব্যক্তি তার নিকট সংশোধনের জন্য আসতো, তখন তিনি প্রথমেই তাকে যিকির-আযকার এবং তাসবীহ এর আমল দিতেন না। বরং তিনি সর্বপ্রথম তাকে বলতেন যে, সমস্ত গোনাহ পরিহার কর। বাস্তবেও সংশোধনের পথে সর্বপ্রথম কাজই হচ্ছে পূর্ণ তাওবা করে নেয়া যে, হে প্রভু! পূর্বে যা গোনাহ হয়েছে সবগুলো থেকে তোমার নিকট ক্ষমা চাই। তুমি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং ভবিষ্যতের জন্য ওয়াদাবদ্ধ হচ্ছি যে, আর কখনও গোনাহ করবো না। অতঃপর সামনে সব ধরনের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবো। শুধু বড় বড় এবং প্রসিদ্ধ গোনাহসমূহ থেকে বাঁচলেই চলবে না বরং ছোট বড় সব ধরনের গোনাহ থেকে বাচতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেনঃ

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ

অর্থাৎ, প্রকাশ্য এবং গোপন সব ধরনের গোনাহকে পরিহার কর।'

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ

অর্থাৎ, যারা গোনাহে জড়িত হয়েছে, তারা অতি সত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (সূরা আনআমঃ ১২০ আয়াত)

তাই কোন গোনাহকেই তুচ্ছ মনে করে অবহেলা করবেন না। এমনটি যেন না হয় যে বড় বড় গোনাহ থেকে তো বিরত থাকলেন, কিন্তু ছোট ছোট গোনাহে অবাধে লিপ্ত হলেন। এক কথায় যে সমস্ত কাজকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোনাহ হিসেবে নির্ণয় করেছেন, সে সবগুলো পরিহার করতেই হবে এবং সর্বদা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

নিজ পরিবারকে গোনাহ থেকে বাঁচান

মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গোনাহ থেকে বাঁচতে হলে, তাকে সর্বপ্রথম নিজের পরিবেশকে দুরস্ত করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী-সন্তান ভুল পথে চলে এবং গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু সে তাদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে। সে ব্যাপারে কোন চিন্তা-ফিকির না করে। তাহলে সে ব্যক্তি গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার যতই চেষ্টা করুক না, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। কারণ এ বিবি-বাচ্চা তাকেও একদিন গোনাহের কাজে লিপ্ত করিয়েই ছাড়বে। তাই মানুষের জন্য যেমনিভাবে নিজে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী, তেমনিভাবে স্ত্রী-সন্তানদেরকেও বাচিয়ে রাখা জরুরী।

আর এ কাজে মহিলাদেরই ভূমিকাই সবচেয়ে বড় দখল। যদি মহিলাদের অন্তরে এ চিন্তা আসে যে, আমরা আমাদের জীবনকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অনুযায়ী চালাবো এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবো। তাহলে ঘরের পরিবেশ ঠিক হয়ে যাবে। কারণ মহিলারাই হচ্ছে ঘরের প্রধান পরিচালিকা। আর যদি মহিলাদের অবস্থা এমন হয় যে, তারা গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকে না। পর্দার কোন তোয়াক্কা করে না, সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকে, তবে ঘরের পরিবেশ খুব খারাপ হবে। সবাই গোনাহে লিপ্ত হবে।

গোনাহ কাকে বলে?

গোনাহ কি? এবং গোনাহের পরিণাম কি? প্রথমে আমাদের সেটা জানতে হবে। গোনাহের অর্থ 'অবাধ্যতা'। যেমন, আপনার কোন মুরুব্বী আপনাকে কোন কাজের আদেশ দিল যে, তুমি এ কাজটি এভাবে কর। উত্তরে আপনি বলে দিলেন যে, আমি তো করতে পারবো না। অথবা বড় কেউ আপনাকে বলল, তুমি এই কথাটি এবং এই কাজটি থেকে বিরত থাক। উত্তরে আপনি বললেন, আমি এ কাজ নিশ্চয় করবো। এই বড়দের কথা না মানাকেই বলা হয় নাফরমানী বা অবাধ্যতা। এই অবাধ্যতা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন বিধানের সাথে হয়ে থাকে, তবে সেটাকে বলা হয় 'গোনাহ'। আল্লাহর সাথে নাফরমানীর পরিণাম এতই ভয়াবহ হয়ে থাকে, যার কল্পনা করাও দুষ্কর।

গোনাহের প্রথম অনিষ্টতা 'অকৃতজ্ঞতার' প্রকাশ

গোনাহের সবচেয়ে বড় অনিষ্টতা হলো 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার কথা ভুলে তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ যে মহান দাতা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সদা-সর্বদা তাদেরকে তাঁর নিআমতের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। মানুষের মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত আল্লাহর নিআমতে পরিবেষ্টিত। যদি শরীরের এক –একটি অঙ্গের মূল্য নির্ধারিত করা হত, তবে বুঝা যেত যে, প্রতিটি অঙ্গ কতই না দামী। এ সমস্ত নেআমত যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে চাওয়া ব্যতিরেকে ফ্রি দিয়ে রেখেছেন, তাই এগুলোর কোন মূল্য আমাদের অন্তরে নেই। আল্লাহ্ না করুন, যদি কখনও কোন একটি অঙ্গ অকেজো হয়ে পড়ে, তখন বুঝে আসে যে, সে অঙ্গের কি মূল্য এবং কত বড় ক্ষতি হয়েছে। আমাদের এই চোখ, আমাদের এই জিহ্বা, কত বড় নেআমত। যদি কোন ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তোমাকে দুনিয়ার সব ধন-সম্পদ দেয়া হবে শর্ত হলো, তুমি তোমার চোখ দু'টি অথবা তোমার জিহ্বাটি অন্য একজনকে দিয়ে দিবে, সে কখনও এতে সম্মত হবে না। সকাল থেকে যে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদেরকে রিযিক দিচ্ছেন এ-ও আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় মেহেরবাণীতেই দিচ্ছেন।

সুতরাং যে মহান দাতা তার নে'আমত দ্বারা আমাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। তার দাবী এই যে, আমরা যেন শুধু সামান্য কয়েকটি কথা ও কাজ যা নিষিদ্ধ তা থেকে বিত থাকি। কিন্তু আমরা এ সামান্য কাজটিও করি না। তাই বলা হয় যে, গোনাহের সবচেয়ে বড় অনিষ্টতা হচ্ছে, মহান দাতার সাথে নিমকহারামী ও তার অকৃতজ্ঞতা। তার প্রাপ্য হককে না দেয়া।

গোনাহের দ্বিতীয় অনিষ্টতা 'অন্তরে মরিচা' পড়া

হাদীস শরীফে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন মানুষ একটি গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে কালো একটি দাগ পড়ে। আবার যখন দ্বিতীয় আরেকটি গোনাহ করে, তখন আরেকটি দাগ পড়ে। যখন তৃতীয় বার আবার গোনাহ করে, তখন আরেকটি দাগ পড়ে। যদি এর ভিতরে সে তাওবা করে নেয়, তবে তার এ

দাগকে মিটিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু যদি তাওবা না করে, বরং একের পর এক গোনাহ করতেই থাকে, তবে ধীরে ধীরে সে কালো দাগটি তার পুরো অন্তরকে পরিবেষ্টিত করে নেয় এবং এ অন্তরে মরিচা পড়ে যায়। আর অন্তরে যখন মরিচা পড়ে, তখন সে অন্তর আর হককে মেনে নেয়ার যোগ্য থাকে না। শুধু তাই নয় বরং এই অন্তর এমন হয়ে যায় যে, তার তখন আর গোনাহকে গোনাহ হিসেবে অনুভব করার শক্তি থাকে না। যেন এ অন্তর জ্ঞান শক্তি ও বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

গোনাহের ক্ষেত্রে মুমিন ও ফাসিকের পার্থক্য

এক রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) ইরশাদ করেন, ফাসেক এবং পাপিষ্ঠরা গোনাহকে এতই তুচ্ছ ও হাল্কা মনে করে, যেন এটি একটি মাছি যা নাকের উপর এসে বসেছে। একটু হাত বাড়ালেই উড়ে যাবে। অর্থাৎ, তারা গোনাহকে খুবই তুচ্ছ মনে করে। পক্ষান্তরে একজন মুমিন যে, এখনও গোনাহে অভ্যস্থ হয়নি। যাকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের বরকত দান করেছেন। সে একটি গোনাহকে পাহাড়ের মত মনে করে। যদি ভুলবশতঃ কোন গোনাহ হয়ে যায়, তখন সে মনে করে যে, তার উপর যেন একটি পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। যার প্রেক্ষিতে সে চিন্তা ও পেরেশানীর গ্লানী উঠাতে থাকে। শুধু তাই নয় বরং মুমিনের অবস্থা হলো, যদি তার কোন সৎ কাজের সুযোগ হয়। কিন্তু কোন কারণে সে তা করতে না পারে, এর জন্য সে পেরেশান হয় এবং বলে, হায় আফসোস! আমার তো এ নেক কাজটি করার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু আমি হতভাগা তা করতে পারিনি। এ সম্পর্কে মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেনঃ

بر دل سالك هزاران غم بود - گر زباغ دل خلالے كم بود

অর্থাৎ, সালেকের (আল্লাহর পথের পথিকের) অন্তরের বাগানের ক্ষুদ্র একটি ফুলও যদি কমে যায় অর্থাৎ, সৎ কাজ করার সুযোগ এসেছিলো, কিন্তু করতে পারেনি, তখন যেন তাদের অন্তরে চিন্তার পাহাড় এসে ভেঙ্গে পড়ে এবং তারা শত সহস্র আফসোস করতে থাকে।

সুতরাং যখন নেক কাজ ছুটে গেলে তারা এত চিন্তিত হন তবে গোনাহ হলে তাঁরা কত বেশী চিন্তিত হবেন? গোনাহকে তাঁরা খুব ভয় করে

থাকেন। কারণ গোনাহ এতই মারাত্মক বস্তু যা মানুষকে উদাসীন করে দেয় এবং এর দ্বারা অন্তরে পর্দা পড়ে যায়।

গোনাহের তৃতীয় অনিষ্টতা অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া

আজ আমরা যেহেতু গোনাহের পরিবেশে থেকে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। তাই গোনাহের যে অনিষ্টতা ও অন্ধকার তা আমাদের অন্তর থেকে মিটে গেছে। নতুবা গোনাহের অন্ধকার এতই মারাত্মক যে, যারা প্রকৃত পক্ষে খাঁটি মুমিন তাঁরা তা সহ্য করতে পারে না।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহঃ) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে দাওয়াত দিলো। তার দাওয়াতে যাওয়ার পর সে খানা পরিবেশন করল আমি খানা খেলাম। পরে জানতে পারলাম যে, তার উপার্জন পথ ছিল হারাম। ভুলবশতঃ সে এক দিনের হারাম খাবার পেটে যাওয়ার পরিণাম এই হয়েছে যে, দু' মাস পর্যন্ত অন্তরে সে হারাম খানার অন্ধকার অনুভব করছিলাম। কখনও গোনাহের আগ্রহ অন্তরে জাগ্রত হতো। কখনও মনে হত যে, অমুক গোনাহটি করে নেই। এর সব খারাপ কাজের আকর্ষণ সে এক দিনের হারাম উপার্জন ওয়ালার দাওয়াতের খানার প্রতিক্রিয়া।

গোনাহে অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত হল এমন যে, দুর্গন্ধময় একটি ঘর। যেখানে সব ধরনের ময়লা-আবর্জনা জমে আছে এবং দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এখন যদি বাইর থেকে কোন ব্যক্তি সে ঘরে প্রবেশ করে, তবে তার জন্য একটি মুহূর্তও সেখানে থাকা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে এমন এক ব্যক্তি যে সে ঘরেই সর্বদা থাকে এবং দুর্গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তার তো কোন কষ্টই হবে না। কারণ সে এতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। এখন যদি কেউ তাকে বলে, তুমি কিভাবে এই দুর্গন্ধময় ঘরে থাক? তোমার নিকট খারাপ লাগেনা? উত্তরে সে প্রশ্নকারীকে বলবে, তুমি তো একটি পাগল। আমি এখানে খুব আরামেই বসবাস করছি। আমার কোন কষ্ট হয় না। ঠিক এমনিভাবে যারা খাঁটি মুমিন। যাদের অন্তর তাকওয়ার কারণে আয়নার মত স্বচ্ছ। তারা গোনাহের ঘোর অমানিশাকে অনুভব করতে সক্ষম হন। কিন্তু আমরা যারা গোনাহে অভ্যস্থ, তারা তা অনুধাবন করতে পারিনা।

গোনাহের চতুর্থ অনিষ্টতাঃ বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাওয়া

মানুষ যখন বরাবর শুধু গোনাহ করেই যায় তখন এক সময় তার জ্ঞান শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার চিন্তা-চেতনা ভুল পথে ব্যবহার হতে শুরু হয়। তখন ভাল কথাও তার নিকট খারাপ মনে হয়। কেউ যদি তাকে সঠিক কোন কথা শত নম্রতার সাথেও বুঝায়, তবুও তা তার ব্রেনে প্রবেশ করে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'যাকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করে দেন, তাকে আর কে হিদায়াত দিতে পারে?' আর আল্লাহ তা'আলা কাউকে কোন কারণ ব্যতীত পথভ্রষ্ট করেন না। গোনাহের কারণে আর তার পক্ষে সঠিক বিষয়কে অনুধাবন করার শক্তি থাকে না।

গোনাহই শয়তানের বুদ্ধিকে নষ্ট করে দিয়েছে

শয়তান গোনাহের উৎস বা গোনাহের প্রতিষ্ঠাতা। কারণ দুনিয়ার বুকে সে-ই সর্বপ্রথম গোনাহের বীজ বপণ করেছে। নিজেও গোনাহ করেছে এবং হযরত আদম (আঃ)-এর মত এক বড় নবীকেও বিভ্রান্ত করছে। এ গোনাহ করতে গিয়ে শয়তানের জ্ঞান শক্তি লোপ পেয়েছিল। যখন আল্লাহ তাআলা তাকে আদেশ দিলেন যে, 'তুমি আদম (আঃ)কে সিজদা কর'। তখন সে যুক্তি পেশ করল, আপনি আমাকে বানিয়েছেন আগুন দ্বারা। আর আদমকে বানিয়েছেন মাটি দ্বারা। সুতরাং আমি আগুন হয়ে মাটিকে কেন সিজদা করবো? তার এই যুক্তিটি তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর যে, মাটির তুলনায় আগুন উত্তম। কিন্তু তার মনে এ কথাটি আসেনি যে, যে আল্লাহ আগুন সৃষ্টি করেছেন, সে আল্লাহ-ই তো মাটি সৃষ্টি করেছেন। আর যখন সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আদেশ দিচ্ছেন, সেখানে কিসের আবার উত্তম আর অধমের প্রশ্ন? এ অবস্থা এজন্য হয়েছে যে, তখন তার জ্ঞানশক্তি লোপ পেয়েছিলো। উপরন্তু আজও আল্লাহ তাআলা তাওবার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন। আজও যদি সে স্বীয় বুদ্ধিকে সহীহভাবে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর নিকট গিয়ে বলতে পারে যে, আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করে দিন। ভবিষ্যতে আপনি যেভাবে বলেন, সেভাবেই চলবো। কিন্তু সে আজও তা করতে রাজী নয়। কারণ তার সঠিক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আর তা হয়েছে গোনাহের কারণেই।

শয়তানের তাওবা

যখন হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য তুর পাহাড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাস্তায় শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ হল। শয়তান তাঁকে বললো, আপনি তো আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য যাচ্ছেন। আপনি সেখানে গিয়ে আমার একটু উপকার করবেন? হযরত মুসা (আঃ) বললেন, বলো, তোমার সে উপকারের কথাটি কি? সে বলল, আমি তো আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়ে পড়েছি। আমার নাজাতের কোন পথ নেই। আপনি আমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন, যেন তিনি আমার তাওবার কোন পথ খুলে দেন। আমার নাজাতের কোন ব্যবস্থা করে দেন। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, বেশ ভাল কথা। আমি এ উপকার করতে পারবো। অতঃপর হযরত মুসা (আঃ) যখন তুর পাহাড়ে গেলেন, আল্লাহর সাথে কথোপকথন হল। কিন্তু তিঁনি শয়তানের সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। যখন কথাবার্তা শেষ করে ফিরে আসছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে কি কেউ কোন সংবাদ পাঠানোর কথা বলেছিল? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি ভুলেই গেছি। রাস্তায় আমার সাথে শয়তানের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমাকে বলল যে, 'আপনি আমার নাজাতের কোন পথ আল্লাহর নিকট সন্ধান করবেন'। তাই আমি সুপারিশ করছি, হে আল্লাহ! আপনি তো অত্যন্ত দয়ালু, আপনি তার মুক্তির কোন ব্যবস্থা করে দিন। উত্তরে আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি কি কখনও বলেছি যে, আমি তাওবার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছি। বরং আমি এখনও তাকে ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত। আর এর পন্থা হল যে, আমি তাকে আগে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তুমি আদম (আঃ)কে সিজদা করো। কিন্তু সে তা করেনি। আর আমি এখন ব্যাপারটি আরো সহজ করে দিয়েছি। এখন গিয়ে শুধু আদম-এর কবরে একটি সিজদা করলেই আমি তার সব গোনাহ ক্ষমা করে দেব। একথা শুনে হযরত মুসা (আঃ) বললেন, এতো খুব সহজ ব্যাপার।

অতঃপর মুসা (আঃ) সেখান থেকে ফিরে আসার সময় পথে পুনরায় শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ হল, তখন সে জিজ্ঞাসা করলো, আমার নাজাতের

কোন ব্যবস্থা হয়েছে? উত্তরে মুসা (আঃ) বললেন, আরে! তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা খুব সহজ ফায়সালা করেছেন। আর তাহল যে, তুমি শুধু আদম (আঃ)-এর কবরে গিয়ে একটি সিজদা করে আসবে। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। একথা শুনে শয়তান বললো, আরে ভাই! এটা আপনি কেমন কথা শুনালেন। যাকে জীবন্ত অবস্থায় সিজদা করিনি, আজ বুঝি মৃত্যুর পর তার কবরে সিজদা করবো? তা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। শয়তান এমন উত্তর এজন্য দিতে পেরেছে যে, গোনাহের কারণে তার জ্ঞান শক্তি হারিয়ে গিয়েছে।

সারকথা গোনাহের প্রতিক্রিয়া এমন যে, সেটি মানুষের বুঝ শক্তিকে অন্ধ করে দেয়। জ্ঞান শক্তিকে শূন্য করে দেয়। যার ফলে হক কথাও তার বুঝে আসে না।

'উদ্দেশ্য' জিজ্ঞাসা করার অধিকার মানুষের নেই

যে সমস্ত বস্তুকে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে গোনাহ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে, সেগুলোতে যারা লিপ্ত, তাদেরকে যদি বলা হয় যে, এ গোনাহগুলো হারাম। তখন তারা সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করে এবং বলে যে, এ গোনাহকে কেন হারাম করা হল? আমি তো এতে অনেক উপকারিতা দেখতে পাচ্ছি। এটাকে কোন উদ্দেশ্যে হারাম করা হল?

এ সমস্ত লোককে জিজ্ঞেসা করবেন, আপনারা কি দুনিয়াতে খোদা হয়েছেন? না কি খোদার বান্দা হয়ে এসেছেন? যদি আপনারা বান্দা হয়েই এসে থাকেন তাহলে আপনারা আপনাদের এই প্রশ্ন করার অধিকারের ব্যাপারটা আপনাদের নিজ চাকরের সাথে তুলনা করে দেখুন। যেমন, আপনি আপনার ঘরের সদাই-পত্র আনার জন্য একজন লোককে চাকর হিসেবে নিযুক্ত করলেন এবং তাকে বললেন, যাও বাজার থেকে অমুক অমুক সদাই নিয়ে এসো। এখন যদি সে চাকর আপনাকে প্রশ্ন করে যে, আগে আমাকে বলুন, অমুক অমুক সদাই কেন আনবেন? কেন এত পরিমাণ আনবেন? কেন এত অহেতুক খরচ করতে যাবেন? উদ্দেশ্য কি? তাহলে, বলুন আপনি কি চাকরের এসব কথা সহ্য করবেন? বরং আপনি তার কান ধরে তাকে ঘর থেকে বের করে দিবেন এবং বলবেন যে, তুমি

হলে আমার চাকর। আমি যা যা করতে বলি তুমি তা করবে বা আনতে বলি তা আনবে। কেন আনবো? উদ্দেশ্য কি? এত কিছু জানার তোমার কোন অধিকার নেই।

একটু চিন্তা করে দেখুন, আপনার একজন চাকর, যাকে আপনি আট ঘন্টার জন্য রেখেছেন। সে আপনার গোলাম নয়। আপনি তাকে সৃষ্টি করেননি। সে আপনার বান্দাও নয়। আর আপনিও তার প্রভু নন। সে শুধুমাত্র আপনার একজন বেতনভুক্ত চাকর। সে যদি কখনও আপনার নিকট কোন কাজের উদ্দেশ্য বা হেকমত জিজ্ঞাসা করে তাহলে আপনি তা সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু আপনি তো আল্লাহ তাআলার চাকরও না, গোলামও না। বরং তার বান্দা। তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তিনি যদি আপনাকে কোন কাজের আদেশ দেন, আর আপনি বলেন– আগে আমাকে এর কারণ বলে দেন। এরপর আমি আমল করব। তবে এ কত বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হবে? বরং এ চাকরের সাথে যে ব্যাপার তার চেয়ে মারাত্মক হবে। কারণ আমিও মানুষ চাকরও মানুষ। উভয়েরই জ্ঞান শক্তি আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ব্যাপারটি তো হল এর ব্যতিক্রম। তার সাথে তুলনা দেয়া তো জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। সুতরাং যারা এ সমস্ত কথা বলে যে, আগে বলুন, হেকমত কি? পরে আমল করবো। তারা এ কারণেই এসব কথা বলে যে, গোনাহের কারণে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে তারা নিমজ্জিত।

সুলতান মাহমূদ গজনবীর শিক্ষনীয় ঘটনা

আমার শায়খ ডাঃ আবদুল হাই (রহঃ) একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। গজনবীর প্রসিদ্ধ বাদশাহ, সুলতান মাহমূদ গজনবীর একজন আদরের গোলাম ছিল। যার নাম ছিল 'আয়াজ'। আর বাদশাহও তাকে অনেক বড় বড় লোকদের উপর প্রাধান্য দিতেন। তার কথাকে এতই গুরুত্ব দিতেন, যা কোন আমীর বা উজীরের কথাকেও দিতেন না। বাদশাহ ভাবলেন যে, উজীর এবং আমীরদেরকে দেখানো প্রয়োজন যে, তোমাদের মাঝে আর 'আয়াজে'র মাঝে কি পার্থক্য।

একবার বাদশাহর দরবারে খুব দামী একটি হিরার খন্ড হাদিয়া আসলো। এ হিরাটি যেমন ছিল খুব দামী। আবার দেখতেও ছিল খুব সুন্দর। বাদশাহের দরবারের সবাই হিরার খন্ডটিকে হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখলো এবং খুব প্রশংসা করলো। অতঃপর বাদশা প্রধান উজীরকে নিজের কাছে ডেকে এনে বললো, তুমি কি এ হিরার খন্ডটি দেখেছো? তোমার নিকট কেমন মনে হয়? উজীর উত্তরে বললো, জাঁহাপনা! এটি খুব মূল্যবান হিরক খণ্ড। পুরো দুনিয়ায় এর কোন নজীর নেই। এরপর বাদশাহ তাকে বললেন, এই হিরক খন্ডটিকে মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও। উজীর দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল এবং বললো, জাঁহাপনা! এটি খুব মূল্যবান হিরক। আপনার নিকট স্মরণীয় উপঢৌকন। তাই আমার আবেদন যে, আপনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন না। বাদশাহ বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে যাও তুমি। অতঃপর বাদশাহ অন্য আরেকজন উজীরকে ডাক দিয়ে বললেন, যাও এই হিরার খন্ডটিকে ভেঙ্গে দাও। সে উজীরও দাঁড়িয়ে বললেন, হুযূর! এটি অত্যন্ত মূল্যবান হিরক খন্ড। আমার পক্ষে একে টুক্‌রো টুক্‌রো করার সাহস হচ্ছে না। এভাবে বাদশা আরও অন্যান্য উজীর ও আমীরদেরকে ডেকে ভাঙ্গার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু সবাই ওজর পেশ করলো। ভাঙ্গার জন্য কেহই সাহস করলো না। অতঃপর সর্বশেষ বাদশাহ 'আয়াজ'কে ডাক দিয়ে বললেন, 'আয়াজ! এই যে দেখ, হিরার খন্ডটি আছে একে উঠিয়ে মাটিতে একটি আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে দাও। 'আয়াজ' হুকুম পেয়ে হিরার খন্ডটি হাতে উঠিয়ে সজোরে মাটিতে একটি আছাড় মেরে একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। বাদশাহ যখন দেখলো যে, আয়াজ হিরার খন্ডটিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছে। তখন তাকে খুব সাশালো এবং বললো, তুমি কেন এত দামী হীরক খন্ডটিকে টুকরো টুকরো করতে গেলে? বড় বড় উজীর ও আমীরগণ, যারা বুদ্ধিমান তারা সবাই বসে আছে। কেউ এতে সাহস পেল না। এরা কি সবাই পাগল? তুমি কেন এত দুঃসাহস করতে গেলে?

'আয়াজ' প্রথমে উত্তর দিল! জাঁহাপনা! ভুল হয়ে গেছে। অতঃপর বলল, আমার মনে এ খেয়াল আসলো যে, এই যে হিরার টুক্‌রো চাই সেটা যতই

দামী হোক, সেটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে আমি তেমন ভয় করিনা যেমন ভয় করি আপনার আদেশকে। অর্থাৎ, আপনার হুকুম আমার নিকট এই হিরার টুকরোর চেয়েও উত্তম। তাই আমি এটা ভাঙ্গতে পেরেছি। কিন্তু আপনার হুকুমকে ভাঙ্গতে পারিনি। অতঃপর বাদশাহ মাহমূদ গজ্‌নবী তার উজীরদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, দেখলে তো? তোমাদের মাঝে আর আয়াজের মাঝে এই হল পার্থক্য। তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দিলে, তোমরা এতে হেকমত ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান কর। কিন্তু সে আমার হুকুমের গোলাম। আমি তাকে যা আদেশ করি, সে তা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। সে কোন হেকমত তালাশ করে না। তাই সে আমার নিকট এত প্রিয়।

ফায়দাঃ মাহমুদ গজনবী একজন মাখলুক। যার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তার উজীর ও আয়াজের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ। কিন্তু মহান প্রভু, যিনি সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তার হুকুমের ব্যাপারে কতটুকু সজাগ হওয়া প্রয়োজন? চাই হিরা ভেঙ্গে যাক। চাই অন্তর ভেঙ্গে যাক। চাই নিজের জীবন পর্যন্ত শেষ হয়ে যাক, তবুও তার হুকুমকে ভঙ্গ করা যাবে না। তার হুকুমের সামনে যুক্তি ও হেকমত তালাশ করা যাবে না। আর যুক্তি ও হেকমত তারাই তালাশ করে গোনাহর করার দরুণ যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আর একথা দিবালোকের ন্যায় ভাস্বর যে, গোনাহের দরুণ অন্তর কলুষিত হয়, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহকে স্মরণ করে তাওবা করে দেখুন, কিছু দিনের জন্য গোনাহ থেকে বেঁচে থাকুন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কি নূর ও বরকত আসে এবং আল্লাহ তাআলা জ্ঞানশক্তিও বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

অর্থাৎঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, (অর্থাৎ তার নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাক), তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে হক ও বাতেলের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন।

আজ তো মানুষ হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। আর এর কারণ হল যে, গোনাহের কারণে অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। জ্ঞান শক্তি বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে।

গোনাহের পঞ্চম অপকারিতাঃ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া

গোনাহের আসল শাস্তি তো আখেরাতেই মিলবে। কিন্তু দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুনিয়াতে গোনাহের অভিশাপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, এক হাদীসে এসেছে, যখন মানুষ যাকাত আদায় করা বন্ধ করে দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা রহমতের বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। কারণ যাকাত আদায় না করাও মহাপাপ।

গোনাহের ষষ্ঠ ক্ষতিঃ রোগ-ব্যাধি বেড়ে যাওয়া

মানুষ যখন গোনাহ ও পাপ কাজে অবাধে লিপ্ত হতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা এমন এমন মারাত্মক রোগ ব্যাধি এ দুনিয়াতে প্রেরণ করে দেন যা আজকের মানুষের বাপ-দাদা তথা পূর্ব পুরুষগণ কখনও দেখেনও নি এবং শুনেনও নি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে বলে গিয়েছিলেন যে, অমুক অমুক রোগ-ব্যাধি দুনিয়াতে আসবে। তা আমরা আজ নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। যেমন, 'এইডস' একটি রোগ, যার হাওয়া আজ সারা দুনিয়ায় বয়ে চলেছে। অথচ পূর্বেকার লোকেরা এ রোগের নাম কখনও শুনেনি। কারণ প্রত্যেক গোনাহেরই একটি প্রতিক্রিয়া আছে। আর তা দৃষ্টান্তমূলকভাবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে কিছুটা দেখিয়ে দেন।

গোনাহের সপ্তম অপকারিতাঃ কাটাকাটি বা খুন রাহাজানি

হাদীস শরীফে এসছে, শেষ যামানায় এমন একটি সময় আসবে, যখন খুন-রাহাজানি খুব বেড়ে যাবে। মানুষকে হত্যা করা হবে কিন্তু তার অভিভাবকরাও জানতে পারবে না যে, কে হত্যা করেছে? কেন করেছে? পূর্বেকার দিনে যদি কাউকে হত্যা করা হত, তবে জানা যেত যে, পূর্ব থেকে দুশমনি ছিল তাই এর জের হিসেবে হত্যা করা হয়েছে।

এই হাদীসের বাস্তব প্রেক্ষাপট আজ আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। আজকেও মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে কিন্তু জানা যায় না যে,

কে হত্যা করেছে? কেন হত্যা করেছে। যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই আজকের অবস্থাকে নিজ চোখে দেখে দেখে বলে গেছেন। আর এসব কাজ আমাদের আমলের দুর্ভাগ্যের কারণেই হচ্ছে। গোনাহই আজ এ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অথচ আজ সে খুন-হত্যা-রাহাজানী বন্ধ করার জন্য বিভিন্নজন বিভিন্ন পন্থা খুজে বেড়াচ্ছেন। কেউ বলছেন- রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যার সমাধান করা হোক, আবার কেউ বলছে পরস্পর বৈঠকের মাধ্যমে এর সমাধান করা হোক। কেউ-ই সঠিক কোন পন্থা খুজে পাচ্ছে না। কারণ সবাই ভুলে গেছে যে, এ সমস্ত অপকর্ম ও খুন-খারাবীর মূল হচ্ছে গোনাহ। যখনই কোন উম্মতের মধ্যে গোনাহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে সমস্ত গোনাহের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিপদ আপদ, খুন-সন্ত্রাস ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে। তাই সর্বাগ্রে গোনাহের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। তবেই অন্যান্য অপকর্মগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

নেক আমলের চেয়ে গোনাহের প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখতে হবে

বেশী বেশী নফল ইবাদতে মগ্ন হওয়া মন্দ কিছু নয়। বরং তা খুবই উত্তম কাজ। তবে এর চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। প্রত্যেক দিন আমার নিকট মা-বোনদের পক্ষ থেকে অনেক ফোন আসে। তারা বলেন, হুযূর অমুক কাজের দু'আ শিক্ষা দিয়ে দিন। অমুক উদ্দেশ্য হাসিল করার দু'আ শিক্ষা দিয়ে দিন। তাদের ধারণা প্রত্যেক কাজের জন্য আলাদা আলাদা দু'আ নির্দিষ্ট আছে। আলাদা আলাদা ওযীফা নির্ধারিত আছে। আরে ভাই! দু'আও ওযীফা প্রত্যেকটাই তার নিজ নিজ স্থানে অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। কিন্তু এর চাইতে মূল্যবান বস্তু হচ্ছে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। নিজেও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকুন এবং সন্তান ও পরিবারের সবাইকে গোনাহ থেকে বাচানোর চিন্তা-ফিকির করুন। যদি এ কাজ না করতে পারেন, তবে যত অধিক তাসবীহ ও ওযীফা আদায় করুন না কেন, তেমন কোন ফল হবে না। হ্যাঁ যদি সম্পূর্ণভাবে গোনাহ থেকে

বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন এবং নিজের স্ত্রী-সন্তান তথা নিজ পরিবারকে গোনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। তবে তখন তাসবীহ ও অযীফা কাজে আসবে। চাই তা পরিমাণে খুব কম হোক।

সারকথা, আমাদেরকে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা করা খুব প্রয়োজন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিসাব লাগাতে হবে, গোনাহের একটি লিষ্ট বানাতে হবে। অতঃপর দেখতে হবে কোন কোন গোনাহ আমার পক্ষ থেকে হচ্ছে। আমার কোন কোন কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টির খেলাফ হচ্ছে? যে সমস্ত গোনাহকে তাৎক্ষণিকভাবে পরিহার করা সম্ভব হয় সেগুলোকে সাথে সাথে ছেড়ে দিবেন। আর যে সমস্ত গোনাহ ছাড়ার জন্য কোন তদবীর করার প্রয়োজন সেগুলোর তদবীর করবেন এবং নিজ গোনাহসমূহের জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করবেন।

তাহাজ্জুদগুজার থেকে আগে বেড়ে যাওয়ার আমল

এক হাদীসে এসেছে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ইরশাদ করেন– কোন ব্যক্তি যদি চায় যে, আমি ইবাদতগুজার ও তাহাজ্জুদগুজারে চেয়ে অগ্রসর হবো, তাহলে তার পন্থা হল, সে নিজকে সব ধরনের গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। যেমন, আমরা অনেক বুযুর্গদের অবস্থা শুনি যে, অমুক বুযুর্গ সারারাত ইবাদতে মগ্ন থাকেন। এত এত রাকাত নফল পড়েন, এত এত পারা দৈনিক তিলাওয়াত করেন, এখন যদি কেউ চায় যে, এ সমস্ত ইবাদতগুজারদের থেকে আগে বেড়ে যাব, তাহলে তার পন্থা হল যে, সে নিজেকে সব ধরনের গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কারণ গোনাহ থেকে বাঁচার দরুন আল্লাহর নিকট মুক্তি পাওয়া যাবে। হয়ত তাদের মাঝে আর আপনার মাঝে এতটুকু পার্থক্য হবে যে, তারা একটু উচ্চ মর্যাদা পাবে। আর আপনি তাদের তুলনায় একটু নীচু আসন পাবেন। কিন্তু নাজাতের ব্যাপারে উভয় সমান। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি খুব ইবাদত করে কিন্তু সাথে সাথে গোনাহও করে, তবে আপনি এমন ব্যক্তির চেয়ে নিশ্চিত আগে বেড়ে যাবেন। কারণ আপনি আপনাকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

মুমিনের ঈমানের দৃষ্টান্ত

এক হাদীসে এসেছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনের ঈমানের দৃষ্টান্ত হল এমন, যেন একটি ঘোড়াকে লম্বা রশি গলায় লাগিয়ে খুটা দ্বারা আটকে রাখা হয়েছে। এ ঘোড়াটি উক্ত রশির আওতার ভিতর থেকে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কখনও যদি সে রশির সীমারেখার বাইরে যেতে চায় তখন সে খুটা তাকে বাধা দেয়। সে ঘোড়া যতই ঘোরাঘুরি করুক অবশেষে তাকে সে খুটার কাছে ফিরে আসতে হয়। তাহলে বুঝা গেল যে, রশি দুটি কাজ করে একটি হল যে, সে ঘোঁড়াকে নির্দিষ্ট সীমারেখা থেকে বাইরে যেতে নিষেধ করে। দ্বিতীয়তঃ সে খুটাটি এ ঘোঁড়ার আশ্রয়ের স্থান। সে ঘোড়া যত দিকেই ঘোরাফিরা করুক, অবশেষে তাকে সে খুটার কাছেই আসতে হয়।

এই দৃষ্টান্ত পেশ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মুমিনের খুটা তার 'ঈমান'। সে ঈমানের দাবী হল, মানুষ নির্দিস্ট একটি সীমার ভিতরে চলাফেরা করবে। কিন্তু যদি কখনও সে নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে যেতে চায়, তখন সে ঈমান তাকে বাধা প্রদান করে। সে ঈমান তাকে ডেকে কাছে নিয়ে যায়। অর্থাৎ, মুমিনের ঈমানের এতই শক্তি যে, মানুষকে সব ধরনের গোনাহ থেকে বাধা প্রদান করে থাকে। এরপরও যদি কখনও ভুলে গোনাহ হয়েই যায়, তবে পুনরায় তাকে সে ঈমানের আশ্রয়ে ফিরে আসতে হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর দৃষ্টান্ত পেশ করে স্বীয় উম্মতকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত